এখানে বিরাজি শুয়ে আছে

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রজ্ঞা প্রকাশন
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-700007

সঞ্জয় চৌধুরীর জন্য

ও স্বপন—স্বপনরে—

কোথায় স্বপন ! মনে মনে ব্রজ বাগচি নিজেকে বললেন, থাকগে খেনে ! এই শীতের ভোরে ছোকরা মানুষ গুঁড়িসুড়ি মেরে ঘুমোচ্ছে —ঘুমোক। এই বয়সে ডাকলে কি ওঠে ? এখন সলিড ঘুমের সময় ওদের।

মাঙ্কি ক্যাপের ভেতর দিয়ে ব্রজ বাগচি দেখলেন, উকিলপাড়ার এক চিলতে গলির ওপারের বাড়িটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। অ্যাতো কুয়াশা। এবার তাহলে রহমতপুরের আমবাগানের গাছগুলোর বউল মার যাবে খুব। সাবধানে বারান্দা পার হলেন তিনি। হবার সময় দেখলেন, সিংহাসনমার্কা বিশাল কেঠো চেয়ারখানা গত তিরিশ বছরের মতই ফাঁকা পড়ে আছে। ওটায় বাবা বসতেন।

রাস্তায় নেমে তিনি গলাবন্ধ কোটের ওপর ভাল করে মাফলার এঁটে নিলেন। পেছনে একবার তাকালেন। দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে। এবার দস্তানায় ঢাকা হাতে বেতের লাঠির ওপর ভর দিয়ে দিব্যি এগিয়ে যেতে লাগলেন।

সারা শহরটা কুয়াশা ছিঁড়ে একটু একটু করে বেরিয়ে আসছে। ডান হাতে কাছারির মাঠ। বাঁ-দিকে জেলা পরিষদ অফিস—ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরির বারান্দায় গোটা তিনেক ছাড়া গরু। কলকাতায় যাবার ফাস্ট লোকালের ইলেকট্রিক বাঁশি। ব্রজ বাগচি খুব সাবধানে ডিস্ট্রিক্ট টাউনের বড় রাস্তায় উঠে ঘাসের কিনারা ধরে হাঁটতে লাগলেন। বেশিরভাগ ভোরবেলাতেই লাইনের বাস বেশি চাপা দেয়।

বিশেষ করে শিকারপুরের বাসের তো কথাই নেই। মাঙ্কি ক্যাপের ভেতর ফিক করে তিনি হেসে ফেললেন। এই জেলা শহরটি ভূগোলের ম্যাপে কর্কটক্রান্তির ওপর বসে আছে। ছেলেবেলা থেকেই তিনি শুনে

আসছেন—এখানে গরমের দিনে অতি গরম পড়ে—শীতে অতি শীত। আর এখানেই বাবা গাঁ থেকে এসে আস্তানা করেছিলেন। গরম জামা-কাপড়ে মোড়া প্রায় মহাকাশচারীর মত দেখতে ব্রজ বাগচি এখন বাস চাপা পড়লে কেউ জানবেও না—মোহিত বাগচির একমাত্র ছেলে মারা গেল। কারণ, মোহিত বাগচিকে যারা জানতো চিনতো তারা বিশেষ কেউ আর বেঁচে নেই। ব্রজ বাগচিকে যারা জানতো তারাই বা ক'জন আর আছে! অথচ এই শহরেরই নতুন একটি মহল্লার নাম—মোহিত-নগর। ঠিক খড়ে নদীর গা ঘেঁষে।

পোড়ামাতলার কাছাকাছি এসে ডানদিকে এগোলে নেদেরপাড়া। বাঁ-দিকে নাকাশিপাড়া। দু'টোর কোনোটায় না গিয়ে ব্রজ বাগচি নদীর পাড়ের রাস্তা ধরলেন। এখানেই জেলা শাসকের বাংলো। গার্ল'স্ কলেজ। খড়ে নদীর ওপারে যাবার পোল।

হাঁটতে হাঁটতে উল্টোদিকে সান্যাল বাড়ির মেজোকর্তার মুখোমুখি হলেন। নাইনটিন থার্টিটুতে এই মেজোবাবুই খদ্দর কাঁধে সারা শহর টহল দিতেন! বাড়ি বাড়ি গিয়ে বেচার জন্যে ভলান্টিয়ার করেছিলেন ব্রজকে। অন্যদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ব্রজও তখন খদ্দরকে পপুলার করেন। এই শীতেও মেজোকর্তা সেই খদ্দরের মোটা কোটের চেয়ে বেশি কিছু গায়ে চাপাননি। তবে মাঙ্কি ক্যাপের গলা কোটের গলার ভেতর নামিয়ে দিয়েছেন।

কে ব্রজ না?

আজ্ঞে। —বলে ব্রজ দেখলেন, মেজোকর্তার পেছনে পেছন তার চরণদার ছোট নাতিটি রয়েছে। পাছে রাস্তাঘাটে আচমকা পড়ে যান মেজোকর্তা—তাই এই সঙ্গী।

তোমার সঙ্গের সেই স্বপন কোথায় আজ?

সঙ্গে নিইনি। বেচারা বড় ঘুমকাতুরে।

না না নেবে। নিতে হবে আমাদের। বয়স কত হল?

এই চুরাশি।

চুরাশি বড় কম নয় ব্রজ। আমি আটাত্তর থেকেই সঙ্গী নিয়ে হাঁটি। তা দশটি বছর হয়ে গেল তারপর। একদিনের জন্যেও একা বেরুইনি। আগে বড় নাতিটি সঙ্গে থাকতো। এখন এই ছোট দাদুভাইকে সঙ্গে নিয়ে থাকি রোজ।

হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে খড়ে নদীর ওপরকার পোলের দিকে এগোলেন। দূরে দূরে আরও দু'চারটি মাঙ্কি ক্যাপের ডগা দেখা যায়। সেই সব মর্নিং ওয়াকারের চেহারা কুয়াশার ভেতর থেকে ফুটে না ওঠা অব্দি তাদের চেনা যাবে না।

ব্রজ বাগচি বললেন, স্বপন একেবারে খোদ কলকাতার ছেলে। এত শীত-ভোরে একদম উঠতে পারে না।

তবে আর রাখা কেন?

আমি তো রাখিনি। কলকাতা থেকে সৌরভ এনে দিয়ে গেছে। আমার আর ওর মায়ের দেখাশুনোর জন্যে।

সৌরভ তো তাহলে কলকাতাতেই থেকে গেল ব্রজ।

হ্যাঁ। খবর পড়ে টি ভি-তে।

দেখে থাকি রোজ। অ্যাকটিংও করে দেখেছি। বেশ করে।

বলেই সান্যালবাড়ির মেজোবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, তবে তো এখানে আর আসছে না সৌরভ।

ব্রজ কোন কথা বলতে পারলেন না প্রথমে। শেষে বললেন, সবাই আপনার ভাগ্যি করে আসে না মেজদা। আপনার দুই ছেলের ভেতর বড়জন এখানে কলেজে পড়ায়। ছোটজন এখানেই ব্যবসা করে। নাতিরাও এখানেই যে যার কারবার নিয়ে বসছে—বসবে।

তাহলে কি করবে ব্রজ?

সৌরভ তো চায় কলকাতায় গিয়ে ওর কাছে থাকি। কিন্তু যেতে পারি কই। বাড়িতে শ্রীধর রয়েছেন। আটশো বছরের গৃহদেবতা। তাকে কোথায় রাখি? ফেলে তো যেতে পারি না—

সঙ্গে নিয়ে যাবে কলকাতায়।

দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাট সৌরভের। সেখানে রাখবো কোথায় শ্রীধরকে? এখানে শ্রীধরের ভোগের রান্নাঘর, ইঁদারা, নিজের ঘর সব আলদা করে বানিয়ে রেখে গেছেন বাবা। পুরুতমশায়ের থাকবার ঘর—শ্রীধরের পুজোর ফুলবাগান—তাও তো বাবা করে দিয়ে গেছেন। ঠাকুরের গহনাও বাবার আমলেই বানানো।

হাঁটতে হাঁটতেই মেজোসান্যাল বললেন, মোহিতকাকার সবদিকে দৃষ্টি ছিল। আমরাও ছোটবেলায় শুনেছি—ও জায়গাটায় বিরাজি নামে একজন মেয়েমানুষের ঘর ছিল। তার নাকি তেজারতির কারবার ছিল।

আমিও শুনেছি মেজদা। মায়ের মুখে। সারাদিন সংসারের কাজ করে বিরাজি সন্ধ্যেবেলা সেজেগুজে তার আদায়াভিমুখে বেরুতো।

একবার নাকি অমন বেয়িয়ে আর ফেরেনি, ব্রজ।

হ্যাঁ। পুরী যাবে বলে পাণ্ডাদের আগাম টাকা পাঠাবে। তাই একখানা অনন্ত বেচতে বেরোয়। বেরিয়ে আর ফেরেনি।

কাকীমা অত জানলেন কি করে?

বাঃ! মায়ের মুখে শুনেছি। আমার খুব ছোটবেলায় বাবা বিরাজির কাছ থেকে জায়গাটা কেনেন। কিনে বিরাজিকেও ঘর বেঁধে থাকতে দেন একপাশে। সেই সময় মা দেখেছেন সব—শুনেছেন সব। সেই যে বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরলো না তো ফিরলোই না। পুলিস এসে নাকি মাটি খুঁড়েও দেখেছিল—যদি কেউ বিরাজিকে খুন করে পুঁতে দিয়ে গিয়ে থাকে। —বলতে বলতে ব্রজ বাগচির মনে পড়লো—সেই কোন্ প্রায় আশি বছর আগের এক ভোরবেলায়—যেন বা পৃথিবীরই প্রথম ভোরবেলায় ব্রজ নামে চার-পাঁচ বছরের একটি বালক দেখেছিল—তাদের বসতবাড়ির পেছন দিককার ফুলবাগান থেকে এলোখোঁপায় ঘাড়টা হেলিয়ে দিয়ে একজন যুবতী ধাঁচের টিপটপ মহিলা বেলফুল তুলে তুলে সাঁজিতে রাখছে। মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি। সেই সমানে দুই ভ্রূর মাঝখান দিয়ে সরলরেখা হয়ে নাক নেমে গেছে সামান্য ভারি ঠোঁটের ওপর। চোখ যেন আগের সন্ধ্যের কাজলে

মাখামাখি। গলায় ভারি পাথরের ছোট হার। শাড়ির লাল পাড় বেশ চওড়া। চোখ দুটি ছোট হলেও চোখ টানে। বালক বয়সেও সব শিশুরই একধরনের রূপ চেনার চোখ থাকে। সেদিন সেই চোখে বিরাজিকে খুব সুন্দর লেগেছিল ব্রজর।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে গার্লস কলেজ পার হলেন। এখনো ক্লাস বসতে দেরি আছে। কুয়াশা ছিঁড়ে আগে তো সূর্য উঠুক। কয়েকটা মাঙ্কি ক্যাপের নিচে মালিকদের চোখ আর নাকের ফুটো এতক্ষণে দেখা যাচেছ। তারা মেজোবাবুর চোখ আর নাকের ফুটোর চেনা আভাস পেয়ে তাদের কাছাকাছি চলে আসতে লাগলেন। এরা সবাই অনেকদিন বাঁচতে চান। সেজন্যে ভোরের টাটকা বাতাসে সবাই বছরের পর বছর হেঁটে চলেছেন। সেই সুবাদে সবাই সবাইকে চেনেন। আসলে এটা আর কি একধরনের ভোরবেলাকার মেশামিশি। খবরাখবর নেওয়া-দেওয়া। কে কে বেঁচে থাকলো। কেমন থাকলো। আবার যারা চলে গেল তারা কিরকমভাবে চলে গেল। সেই সব জ্ঞান চালাচালি। লেনদেনও বলা যায়। এখন মাঙ্কি ক্যাপে ঢাকা পাঁচখানি মাথা কাছাকাছি হয়ে পোলের দিকে এগোচেছ। এরা যেন এখনকার এই সময়ের নয়। মাঙ্কি ক্যাপের বাইরে শীতে, কুয়াশায় কুঁকড়ে যাওয়া দুনিয়া বুঝি এইতো সেদিনকার। আর তার মাঝখান থেকে এগিয়ে যাওয়া ওরা ক'জন যেন গতকালের। কি করে যেন রয়ে গেছেন।

শীতে ঠাণ্ডায় লোহার পুলের গা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা শিশির পড়ছে। পাঁচজনই নিজেদের জানান দিতে যে-যার হাতের লাঠি লোহার রেলিংয়ে ঠং করে মেরে এগিয়ে গেলেন। এখন ওরা খালের সমান সরু খড়ে নদীর বুকের ওপর পোলের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে পড়ে ওরা একসঙ্গে পুবের আকাশে তাকালেন। কোথায় সূর্য! এখনো শ্লেষ্মার দলা হয়ে সারা পুবদিক জুড়ে শুধুই কুয়াশা ঝুলছে।

স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই নেতা গোছের মানুষ মেজো-সান্যাল। স্বাধীনতার পর বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বছর কেটে গেলেও আজও

মেজো সান্যাল যেন সেই নেতা গোছেরই মানুষ। স্বাধীনতার পর থেকে সব জমানাতেই তার দিকে ঝোল গড়িয়ে গেছে। এর ওপর তাম্রপত্র, পেনশন তো আছেই। পূব-আকাশে সূর্যকে দেখতে না পেয়ে তিনি বললেন, জানো ব্রজ। আমিও বংশের বালগোপালকে নিয়ে ধন্দে পড়েছি—

এক মাণিক ক্যাপ বললেন, গোপাল তো ভালই। আমাদেরটির সেবা করে আমার দিনটি বেশ সুন্দর কেটে যায়। সবসময় মনে হয় দাদা—আমি একা নই। আরও কে একজন আছেন বাড়িতে। তার জন্যেই আমার থাকা দরকার।

মেজোবাবু বললেন, আমারও তাই কাটে। এমনিতে কোন ধন্দ নেই। তবে ভাবি— যখন থাকবো না—তখন গোপালের কি হবে? ছেলেরা—নাতিরা তো এসবের ধার ধারে না।

মাণিক ক্যাপ বললেন, আমাদের নন্দকিশোরের সারাদিনের ভোগ, চান, শয়ানের যোগাড়যন্তর করতে করতেই সারাটাদিন কোত্থেকে কেটে যায়—টেরই পাই না। এসব শিশু, কিশোর ভগবানরা আমাদের মুখ চেয়ে নেই মেজদা। এই করেই তো ওরা এক এক বাড়ি চারশো পাঁচশো, আটশো বছর কাটিয়ে দিচ্ছেন। ধরুন আপনাদের সান্যাল ঘরে বালগোপাল এসেছিলেন আজ থেকে সাতশো বছর আগে। ইতিহাসে দেখুন দিল্লির মসনদে তখন আলাউদ্দিন খিলজি।

ব্রজ বাগচি বাধা দিয়ে উঠলেন, সেই কবে হিস্ট্রির টিচারি থেকে রিটায়ার হয়েছো ভাই- আজও ভুলতে পারলে না!

মাণিক ক্যাপ লজ্জা পেলেন। বললেন, রিটায়ার তো আঠেরো বছর হয়েছি। আমি বলতে চাই—সেই আলাউদ্দিনের সময়ে এসে বালগোপাল সেদিন কি আজকের মেজদার হাতে কবে থেকে তোলা হয়ে থাকবেন—সেজন্যে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন এতকাল?

ব্রজ বাগচি বললেন, শ্রীধরের দেখাশুনোর জন্যে বাবা রহমতপুরে সাতাশ বিঘে জায়গা দেবোত্তর করে রেখে যান।

মেজো সান্যাল বললেন, রহমতপুরের জায়গা তো সোনা। ওখানে রবি খন্দ জমে ভাল। তার ওপর স্বাধীনতার পরে ক্যানাল গেছে রহমতপুরের ভেতর দিয়ে। তিনটে ফসল এখন চোখ বুজে হয় ওখানে। মোহিতকাকার বুদ্ধি ছিল।

দেশভাগের সময় ভয় হয়েছিল—এই বুঝি রহমতপুর ওপারে পড়ে যায়। যাক পড়েনি। ওখানে তামাক, আম, গুড়, পাট যা হোত তাই বেচে দিয়ে বাবা শ্রীধরের সম্বচ্ছরের সেবার ব্যবস্থা করতেন। এখন আর জায়গাটা নেই।

মেজো সান্যালের বুকে যেন রক্তচাপ বেড়ে গেল এক ধাক্কায়। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, নেই? মানে? কি বলছো ব্রজ?

যা বলছি ঠিকই বলছি মেজদা। পরে আর ফসল পাচ্ছিলাম না। ভাগীদাররা ঠকাচ্ছিল। শাসাচ্ছিল। দিলাম বেচে—

তারপর?

সেই টাকা ডাকঘরে রেখেছি।

ভাল করেছো ব্রজ।

তারসঙ্গে আরও কিছু টাকা রেখেছিলাম।

সৌরভ দিল?

না মেজদা। আপনার মনে আছে কি না জানিনা বাবা ওকালতি করতে এখানে উঠে আসেন।* জেলা আদালত তো এখানেই। আমরা দৌলতপুরের ঝাউদিয়ার বাগচি। তা দেশভাগের সময় ঝাউদিয়া ওপারে পড়ে গেল। ওখানে ঝাঝা আর চন্দনা নদীর গা-ধরে বাবার পৈতৃক বড় জায়গা ছিল। সে বাবদে এনিমি প্রপার্টি সুবাদে লাখ দেড়েক টাকা পাই।

বাঃ। খুব সুখবর। টাকাটা খরচ করে ফ্যালোনি তো ব্রজ?

একটি পয়সাও খরচা করিনি মেজদা। সব শ্রীধরের নামে ওই টাউন ডাকঘরে জমা করেছি। শ্রীধরের সুদে আমার আর লাবণ্যের খরচ-খরচাও দিব্যি চলে যায়। তারপর সৌরভ তো পাঠায়।

তবে তো খুবই ভাল আছো।

না। ভাল নেই মেজদা।

কেন? কেন?

আমাদের তো চলে যাচ্ছে। লাবণ্যের শরীর খারাপ হোল তো পাঁচ মাস কলকাতায় নার্সিং হোমে রেখে চিকিৎসা করিয়ে আনলাম। আমার মাথা ঘোরে তো ঘৃতকুমারী বেটে মাথায় লাগালাম। কিন্তু—

কিসের কিন্তু?

আমরা যখন থাববো না—তখন শ্রীধরের কি হবে? কে দেখবে?

হিস্ট্রির সেই রিটায়ার টিচার বললেন, আমাদের টাকা দেখবে।

টাকায় কি সব হয়? —বলে মেজো সান্যাল বললেন, ওই তো মোহিতকাকা রহমতপুরে দেবোত্তর করে রেখে গিয়েছিলেন সাতাশ বিঘে। তাতে কি শেষ অব্দি হোল? ব্রজ ছিল বলে শ্রীধর তরে গেলেন। টাকার সঙ্গে একজন মানুষও লাগে।

ব্রজ বাগচি পুবাকাশে তাকিয়ে বললেন, একজন যদি তেমন মানুষ পাওয়া যেতো—যে কিনা—আমরা যখন থাকবো না—ডাকঘর থেকে মাসে মাসে টাকা তুলে শ্রীধরের ব্যবস্থা করবে ভালমত—সেই সঙ্গে তার নিজেরও চলে যাবে ভালভাবে।

হিস্ট্রির রিটায়ার টিচার বললেন, আমি লোকাল কালীবাড়ির সেবাইতকে বলেছিলাম। রাখুন না আমার নন্দকিশোরকে। অনেককেই দেখেছি—বাড়ির বিগ্রহ কালীবাড়ি জমা করে দিয়ে গেছেন। তা বলে কি—

কি বলে?

পঞ্চাশ হাজার টাকার ইউনিট ট্রাস্ট সেবাইতের নামে কিনে দিতে হবে। সেই সঙ্গে—

ব্রজ বাগচি বেশ কষ্ট পাওয়া গলায় বললেন, ওখানে গৃহদেবতাদের যে অছেদ্দা—তা দেখে সেবাইতের ওপর আমার অভক্তিই বেড়েছে। ওভাবে কি ঠাকুর ফেলে রাখা যায়?

কেন ? কেন একথা বলছো ব্রজ ?

গিয়ে দেখুন গে একবার। মাকালীর একপাশে গাদা গুচ্ছের শালগ্রামশিলা ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। যেন ট্রেন অ্যাকসিডেন্টের লাশ সব। না সময়ে চান করানো—না সময়ে খাওয়ানো। না দুটি বেলপাতা! চন্দনের বালাই নেই। কতকাল ওঁদের শয়ান হয়নি কে বলবে! শীতে লেপ জোটে না। রাতে মশারি নেই। সারারাত মশা কামড়ায়। সারাটা বোশেখ মাস ঝারি করে শেতল দেওয়া হয় না কোনকালে। দোলে একটু আবির জোটে না। —বলতে বলতে কান্নায় গলা বুজে এল ব্রজ বাগচির।

থামলে কেন ব্রজ। বল।

ব্রজ বাগচি সবার গোপনে কোটের হাতায় মাঙ্কি ক্যাপের নিচে নিজের দু'চোখ মুছে নিলেন। নিয়ে বললেন, রাসে দু'খানি কেত্তন শোনানো হয় না ওদের কতকাল। দেখে তো আমার বুক ফেটে যায় মেজদা। যন একদল নিরুপায় বিধবাকে কাশী পাঠিয়ে দিয়ে বিবেকের হাত থেকে খালাস পাওয়া। ওঁদের ওপরে এখন পচা ফুল বেলপাতা ফেলার জায়গা হয়েছে। অমন এজমালি দেখাশুনোয় আমার শ্রীধরকে আমি দিতে পারি না।

সূর্য এবার জেলা টাউনের ওপর একটু একটু করে তাকাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে মাঙ্কি ক্যাপটা খুলে ফেললেন মেজো সান্যাল। খুলে ফেল ল মাথায় সাদা চুলের বাবড়ি সাবেক যৌবনের অভ্যেসে ডান হাত দিয়ে দুপাশে পালিশ করলেন মেজোকর্তা। এখন বাড়ি ফিরে ঘরের গরুর দুধে দু'খানা হাতে গড়া রুটি ডুবিয়ে খেয়ে নেবেন। তিরিশ বছরের ওপর বউ নেই। বড়ছেলের বউ মেজোকর্তার বড় মেয়ের মত। তিনি বললেন, অনেকদিনকার আগের কথা একটা মনে পড়ছে। তখন জেলা আদালতে মোহিতকাকা ডাকসাইটে উকিল।

বলার ঢং দেখে বড় ভাল লাগলো ব্রজ বাগচির। মোহিত বাগচি

শুধু তার বাবাই ছিলেন না। তিনি এ শহরের মানুষের কাছে গর্বের জিনিস ছিলেন।

মেজো সান্যাল বললেন, একটা দেবোত্তর সম্পত্তির মামলার ফাইনাল সওয়াল করতে উঠে—ডিস্ট্রিক্ট জজ তখন লালমুখো বাঘা ম্যালকম সাহেব—মোহিতকাকা একটা বড় সুন্দর কথা বলেছিলেন। দি হিন্দু ডেইটি ইজ পারপিচুয়াল মাইনর!

ঠিকই তো বলেছিলেন বাবা। শ্রীধর, বালগোপাল, নন্দকিশোর—এঁরা তো সবাই অনন্ত বালক—অনন্ত বালক, কিশোর—চিরকালের নাবালক। কোনদিনই বয়স বাড়ে না ওদের।

বাকি চারজনও মাঙ্কি ক্যাপ খুলে ফেললেন। কেউ কেউ মাফলারও। সূর্য একলাফে উঠে পড়েছে। গার্লস কলেজের মেয়েরা হেঁটে হেঁটে আসছে। আবার পোড়ামাতলা। নেদেরপাড়া। মফস্বল শহরের খাটা পায়খানা। একদম সাদা, কাঁচাপাকা পাঁচ-পাঁচখানি মাথা শহরের পাঁচদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

জেলা পরিষদ লাইব্রেরির কাছাকাছি আসতে ব্রজ বাগচির কানে গেল—কলেজ যাওয়ার পথে দুটি মেয়ের ভেতর একজন তাকে দেখিয়ে অন্যজনকে বলছে—ওই দ্যাখ। সৌরভ বাগচির বাবা—কথাটা কানে যেতেই সারা গা চিড়বিড় করে উঠলো ব্রজ বাগচির। তিনি হাঁটার স্পিড্ বাড়িয়ে দিয়ে মনে মনে বললেন, না। আমি মোহিত বাগচির ছেলে—

জেলা আদালতের গা ঘেঁষে যতই তিনি নিজের পাড়ায় ঢোকেন—ততই চোখে পড়ে—ছেলেবেলার ছুটোছুটির সঙ্গে মেশানো এইসব বাড়ি ঘর, বারান্দা, ছুটে বেড়াবার পাঁচিল, চাতাল, উঠোনের গায়ে সবুজ রঙ-এর অনেক শ্যাওলা জমেছে। দেওয়ালগুলো কালচে হয়ে তার খাঁজে খাঁজে আমরুলি পাতা, অশ্বত্থের শেকড়। ফাটাচটা সব চিলেকোঠা।

বলা যায়—বাবা যখন প্রায় প্রৌঢ়—তখন খড়ে নদীতে বাঁধ দিয়ে শহরের শেষে চাষীদের নিয়ে সমবায় চাষ করেন। তাতে মায়ের সব গহনা বাঁধা দিতে হয়েছিল। বাবা চাষে নেমে ফতুর হয়ে যান। তখন তো ধানের দর পাওয়া যেতো না। সে জায়গায় বাবা শেষে মানুষ বসালেন। লোকের মুখে মুখে নাম হয়ে গেল জায়গাটার- মোহিত-নগর। আমি সেই মোহিতের ছেলে ব্রজ।

কিন্তু এখন কেউ জানেই না—কে এই মোহিত? কেননা তখনকার মানুষজন শহরে আর প্রায় নেই। জানার কোনও আগ্রহও নেই কারও। মোহিতনগর এখন মিউনিসিপ্যাল ভোটে স্রেফ বারো নম্বর ওয়ার্ড। এখন আমি ঘরে ঘরে টিভি-র সংবাদে স্রেফ সৌরভ বাগচির বাবা!

পুরো ব্যাপারটাই কেমন চালাকি বলে মনে হয় ব্রজ বাগচির। একটা মানুষ কিছু বানাতে গিয়ে—গড়ে তুলতে গিয়ে- সর্বস্ব দিয়েও ফতুর হয়ে গেল। তার বসানো মানুষজনের বসতি—তার বসানো গাছপালার ছায়া—তার বানানো রাস্তাঘাট, ইঁদারা, টিউবওয়েল—তার টেনে দেওয়া ইলেকট্রিকের লাইন দিয়ে একটা নগর জমে উঠলো। সেটা সবাই ভুলে গিয়ে সন্ধ্যেরাতে মাঝে মাঝে মিনিট পনেরোর খবর পড়া- মাঝে মধ্যে আধঘণ্টাটাক অ্যাকটিং—তাই মনে করে রাখলো পাবলিক? আশ্চর্য! সর্বস্বান্ত হয়ে বর্ষার খড়ে নদীকে বেঁধে ফেলা কিছু নয়? যদিও খড়েকে শেষ অব্দি বাঁধা যায়নি! মাটি আর বাঁশের বাঁধন ভাসিয়ে মোহিত বাগচির ফলে ওঠা ধানের মাঠ খড়ে আগাগোড়া ডুবিয়ে দিয়েছিল। একেই বলে ফতুর হওয়া। নদীর কাছে। খরার কাছে। অজন্মার কাছে। কী বিরাট বুক ধসানো নাটক। সেটা কিছু নয়? সে নাটকের অ্যাক্টর কিছু নয়? তাঁর চেয়ে বড় অ্যাক্টর তাহলে কে? সৌরভ বাগচি?

যেতে যেতে ব্রজ বাগচির মনে পড়লো—মোহিতনগর হবার মুখে বাবা আবার শূন্য থেকে ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। মায়ের বন্ধকী

গহনা সব ছাড়িয়ে আনেন। দেশভাগে মানুষের ঢল খড়ে নদীর পাড়ে গিয়ে পড়লো। বাবা প্লট করলেন। টাকা এল।

ব্রজ বলেছিলেন, বাবা। টাকা আসছে। এবার রেখে দিন। দুঃসময় জানান না দিয়েই আসে।

রেখে দিলে তুমি খরচা করবে। যে-টাকা তুমি ঘাম দিয়ে আয় করোনি—সে টাকা ফুরোতে তোমার গায়ে লাগবে না ব্রজ। সে টাকায় তোমার কোন মায়া থাকবে না!

তাহলে কি করবেন?

যেখানে বাঁশবাগান, ডোবা, এঁদো পুকুর পাবো—যা কেউ কিনবে না—তাই একটার পর একটা কিনে রেখে যাচ্ছি। দেখো পরে কাজে লাগবে।

নিজের বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে ব্রজ বাগচি মনে মনে বললেন, বাবা! আপনি অনেকদূর দেখতে পেতেন। অনেকদূর। —বলতে বলতে টানা বারান্দায় বাবা চলে যাওয়ার পর অনেকদিন খালি পড়ে থাকা বাবার সিংহাসনমার্কা চেয়ারখানিতেই বসলেন ব্রজ বাগচি। বসে মর্নিং ওয়াকের জুতো খুললেন। জুতোর গায়ে ভোরের শিশির ভেজা শুকনো ঘাসের ভাঙা ডগা। মোজা খুলতে যাবেন ব্রজ। বাধা পেলেন।

পিঠ থেকে পাকা চুলের ঢাল মেঝেতে পড়লো। লাবণ্য উবু হয়ে বসে ব্রজ বাগচির পায়ের মোজা খুলতে গেলেন। ব্রজ বাধা দিলেন। পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, না। ওসব পুরনো অভ্যেস ছাড়ো তো। তোমারও বয়স হয়েছে লাবণ্য। খেয়াল আছে?

তাহলে আমি কি করবো? সত্তর বছর হল বউ হয়ে এসেছি এ বাড়ি। একে একে সবাই চলে গেছেন। জমজমাট বাড়ি একদম ফাঁকা লাগে এখন। একটা কিছু তো করবো।

শ্রীধরের সেবা করো। আর কি করবে? সৌরভ তো এখানে থাকলো না। থাকলে নাতি-নাতনি নিয়ে নাড়তেচাড়তে।

ছেলের কথায় লাবণ্য চুপ করে গেলেন। উঠে দাঁড়িয়ে লম্বা টানা বারান্দার দিকে তাকালেন। আগাগোড়া ফাঁকা। এ বারান্দায় বসে বাবা শেষ বয়সে হোমিওপ্যাথির ওষুধ দিতেন সবাইকে। সৌরভ হল বেশি বয়সে। বাবার খুব ন্যাওটা ছিল। বাবার ওষুধের পুরিয়া সে রুগীদের এগিয়ে দিত।

ব্রজ বাগচি কিছু বললেন না। মনে মনে বললেন, আমার দিদিরা একে একে বিধবা হলে বাবা ওকালতি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসে গেলেন। কথা বলতেন না। ভোরে উঠে এই চেয়ারে বসে রুগী দেখতেন। সামনে থাকতো হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স আর সৌরভ।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে মোহিত বাগচির ঘর দেখা যায়। তাঁর ওকালতি বইতে ঠাসা আলমারিগুলো আজ বহু বছর বন্ধ হয়েই আছে। খোলা হয়নি। মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলতে যে টেবিলে তিনি কনুই রেখে বসতেন—তার ওপর একটি হুলো বেড়াল বসে বসে ঘুমোচ্ছে।

লাবণ্য হঠাৎ বললেন, আপনার জন্যে রস দিয়ে গেছে—

রস ?

হ্যাঁ। খেজুর রস। মোহিতনগরে বাবা কোন্ গাছিকে বসিয়ে যান। তার ছেলের ঘরের নাতি দিয়ে যাবার সময় আপনার নাম করে বলে গেল—ব্রজবাবু খাবেন—

আঃ! কতকাল রস খাই না। – বলে উঠে দাঁড়ালেন ব্রজ বাগচি। ভাল কথা। একটা গ্লাস মেজে আনো তো। শ্রীধরকে দেব।

একথায় আশির কাছাকাছি লাবণ্য যেন জলতরঙ্গের গৎ হয়ে দ্রুতলয়ে ভেতরে যেতে যেতে বললেন, মাজাই আছে ভেতরে। আপনি দিন না। আমি যে শ্রীধরের অন্নভোগ বসিয়েছি—

কাপড়খানা ছেড়ে ব্রজ কাচা কাপড়ে উঠোনে এলেন। সাবেক কালের বাড়ি। বড় ইঁদারার পাশেই শ্রীধরের থাকার ঘর। রান্নাঘর। তার ভোগ চড়েছে উনুনে। আতপ চাল। সুগন্ধী। পাঁচ রকমের ব্যঞ্জন রাঁধার সময় লাবণ্য এবার খুন্তি নাড়বেন। মায়ের আমলে মা

বলতেন—ব্যান্নন। সব সাজিয়ে দিয়ে শ্রীধরের জন্যে ছোট বাটিতে দুধ গুড়ও দেওয়া হয়।

উঠোন জুড়ে বড় ইঁদারা। ভেতরে নামার জন্যে ইঁদারার গায়ে ভেতর দিয়ে কিছুদূর অন্তর লোহার আঙটা নিচে নেমে গেছে। বাবা নিজে তাজা বয়সে ওই আঙটায় পা দিয়ে অনেকটা নিচে নেমে যেতেন। নেমে গিয়ে চুন ছড়াতেন। এইভাবে জল শোধন হয়। ছেলেবেলার এসব কথা ব্রজ বাগচির মনে আছে। তখন একবার তার বাবা বলেছিলেন—ইঁদারার সঙ্গে খড়ে নদীর যোগ আছে। বালক ব্রজ অবাক হয়েছিল। তাদের বাড়ি থেকে খড়ে নদী কম করেও এক মাইল। এই মাইল খানেক জায়গার ওপর বসতবাড়ি, স্কুলবাড়ি, বড় বড় গাছপালা, পিচ রাস্তা -কত কি। এদের তলা দিয়ে খড়ের জল কী করে তলে তলে গড়িয়ে গড়িয়ে ঠিক মোহিত বাগচির ইঁদারায় এসে পড়ে? এই জল খেলে একসময় পেটের গোলমাল সেরে যেতো। নাকাশিপাড়া, স্টেশনরোড—দূর দূর পাড়ার লোক এসে এই ইঁদারার জল এক সময়—ঘড়া ভরে নিয়ে যেতো। এখন আর এ জলের সে গুণ নেই। সারা শহরটাই অন্যরকম হয়ে গেল। এ অবস্থায় জল কি করে আর সেরকম থাকে? যেখানে হামাগুড়ি পেছনে ফেলে হাঁটতে শেখা—তারপর একদিন মাথার ওপর বাবা মা হারানো—শেষে নিজে সবার মাথার ওপর উঠে টিকে থাকা—তখন কি আর সব মনের মত মেলে! মেলে না। তা জানেন ব্রজ বাগচি।

শ্রীধরের নিজের রুপোর বাসন আছে। তারই একটি গ্লাসে পরিমাণমত খেজুর রস ঢেলে শ্রীধরের সামনে রাখলেন ব্রজ। রাখতে রাখতে বললেন, রয়ে সয়ে খেয়ো। নতুন রস। পেট ছাড়বে—

বলতে বলতে ব্রজ বাগচি দেখলেন, পাথরের বিঘৎখানেক শ্রীধর দাঁড়ানো ভঙ্গিতে তার মুখে তাকিয়ে চাপা হাসি হাসছে।

ব্রজ বাগচি বললেন, তব খেয়ে নাও সবটা। তুমি তো কথা শুনবে না।

শ্রীধরের ঘরখানি ইঁদারার কাছাকাছি। ঘরের ভেতর আবছা অন্ধকার। বাইরে ইঁদারার মুখে হাসি হাসি রোদ। পলকে একটা কথা মনে পড়লো ব্রজ বাগচির। তার তখন দশ-বারো বছর বয়স হবে। ফার্স্ট গ্রেটওয়ার বছর খানেক হল থেমেছে। মোহিত বাগচি তাকে সঙ্গে নিয়ে পাটনায় একটি মামলা লড়তে গিয়েছিলেন। মাত্র কয়েক বছর হল বিহার আলাদা হয়েছে। নয়তো ওসব দিক কলকাতায় বসেই ইংরেজরা শাসন করতো। বাবার সঙ্গে অনেক ঘুরেছিল সেবারে ব্রজ। নদীগুলোর নাম বড় সুন্দর। নর্মদা, সরযূ, গণ্ডক, কর্মনাশা। কর্মনাশার জল নাকি আগে কেউ গায়ে দিত না। এত অপবিত্র। বুক বুজে আসা একটা নদীর খাত দেখিয়ে বাবা বলেছিলেন, বর্ষায় এর নাম গণ্ডক। চারদিক ভাসায়। ওই যে পাথর দেখছিল—ওদের থেকেই শালগ্রাম শিলা।

ব্রজর গোড়ায় বিশ্বাস হয়নি। বালির ভেতর নুড়ির চেয়ে বড়—কালো কালো পাথর এখানে সেখানে মাথাগুঁজে পড়ে আছে। শালগ্রাম শিলা তো ভগবান। ঈশ্বর। গড্। তাঁরা ওখানে পড়ে আছেন। ভগবানের এত ছড়াছড়ি?

মোহিত বাগচি তখন বড় উকিল হয়ে উঠছেন। তিনি তার তিন মেয়ের পর সবেধন ছেলেকে বুঝিয়েছিলেন—আমাদের কোন পূর্বপুরুষ স্বপ্নে কোন ভগবানের মুখ দেখেন। আবছা মত। ভাসা ভাসা। তারপর পায়ে হেঁটে গণ্ডকের তীরে এসে হাজির হন। তখন তো ট্রেন ছিল না।

কতদিন আগে বাবা?

শুনেছি—আটশো বছর আগে। তা এখানে একবার এসে পড়তে পারলে গৃহদেবতা নিজেই চেনা দেন—নিজেই ধরা দেন। দু'একদিন গণ্ডকের তীরে ভাত ফুটিয়ে খাবার পর গেরস্থর আধোঘুমে—আধো-জাগার ভেতর পাথরে ভর হয়ে ভগবান ঠিক এসে চোখের সামনে দাঁড়াবেন। তখন গণ্ডকের বালিভরা বুকে শুধু একবার নেমে পড়তে হয়। নেমে খুঁজে নিতে হয়।

জল থাকলে ?

তা হবার নয়। শীতেই আসতে হয় এখানে।

কৃশ ? রোগা মত ? কয়েকশো মাইল রাস্তা হেঁটে গিয়ে একদিন শীতের দুপুরে গণ্ডকের শুখো বুকের সামনে দাঁড়িয়েছেন। স্বপ্নের ভাসাভাসা পথ ধরেই এই আসা। রাস্তায় ঠ্যাঙাড়ে। বাঘ, সাপ। সব পেরিয়ে স্বপ্নের ভগবানটিকে চিনে তুলে নেওয়া। ভগবানও চেনা দেন। দিয়ে শেষে নিজেই ধরা দেন।

খেজুর রসের গ্লাসটি আরেকটু এগিয়ে দিলেন ব্রজ বাগচি। খেয়ে নাও শ্রীধর—

বলেও ব্রজ শ্রীধরের মুখে তাকালেন। এমনিতে তেল চুকচুকে ল্যাপাপোছা গোলমত একখানি পাথর মাত্র। কিন্তু ওর ভেতর ব্রজ বাগচি শ্রীধরের চিবুক, টানা টানা দুই চোখ—টিকালো নাক, ঠোঁটে চাপা হাসি—সবই দেখতে পান।

এখনো—এই সকালবেলায় ব্রজ বাগচি যেন শ্রীধরের গা থেকে উঠে আসা পদ্ম পাপড়ির গন্ধ পেলেন। দেখলেন—ঠোঁটে লজ্জার হাসি। চোখে রসটুকু সবটা খেয়ে নেবার ইচ্ছে।

—আচ্ছা। আচ্ছা। আমি দেখছি নে—তুমি খেয়ে নাও। —বলতে বলতে ব্রজ বাগচি নিজেকে বললেন, ব্রজ। তুমি খুব ভাগ্যবান। এভাবে শ্রীধরকে ক'জন দেখতে পায়! এই দুনিয়ায় শ্রীধরের চেয়ে বড় কে আর আছেন ? তবু কী বালক! কী লজ্জা! শ্রীধর! তুমি এই দুনিয়ায়, সবখানিই তোমার চোখ। এই দুনিয়ার সবখানিই তোমার মুখ। তোমার কান। তোমার নামের চেয়ে মধুর যে আর কিছু নেই।

ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে চুরাশি বছরের ব্রজ বাগচি হাঁকছিলেন। ও স্বপন। স্বপনরে -

কোত্থেকে বছর চোদ্দর একটি ছেলে ছুটে এল। খালি গা। টান-

টান। হাফপ্যাণ্ট এঁটে বসেছে পাছায়। সরু কোমর চ্যাটালো বুকখানা যেন ধরে রাখতে পারছে না। চোখ দুটি জ্বলছে। বটা মত ভাঁজ করা ঠোঁট। একমাথা চুল। আমায় ডাকছিলে দাদু—

ব্রজ বাগচি গোড়ায় কোন কথা বলতে পারলেন না। পৃথিবীতে নতুন এলে মানুষ বড় তাজা হয়। শেষে বললেন, কোথায় ছিলি ?

তোমাদের উত্তরদিকে যে ঘরখানা পড়ে গেল সেদিন—তার ভেতর থেকে কড়ি বরগা টেনে টেনে বার করছিলাম।

সেজন্যে তো মিস্ত্রি, যোগাড়ে কাজে লেগেছে। তুই কেন ?

কেমন সরু সরু ইট। পুরনো কাঠ সব বেরুচ্ছে। দেখছিলাম।

তোদের বাড়ি কি ইট কাঠের।

নাঃ। বাবা কাঁসাইয়ের পাড়ে কাঁসাইয়ের বালি আর মাটি দিয়েই মাঠকোঠা তুলেছে। চালে গোলপাতা।

মোহিত বাগচির বিরাট বাড়ি। একটা একটা করে ঘর-দালান পড়ে যাচ্ছে। গতবছর এ-বাড়ির হালে বানানো দিকটায় উঠে এসেছেন ব্রজ বাগচি। হাল—মানে তাও প্রায় ষাট বছর আগে গাঁথা। তখন সবে সিমেন্ট তৈরি হচ্ছে ইন্ডিয়ায়। তখনকার বানানো। মুখে বললেন, যা সর্ষের তেলটা রোদে দে। আজ পিঠে ডলে ডলে মাখিয়ে দিবি।

ইদানীং খুব একটা মুশকিল দেখা দিয়েছে ব্রজ বাগচির। কোর্টে গিয়ে ওকালতি করা ছেড়ে দিয়ে বেশি বয়সে ব্রজ সরকারি চাকরি নিয়েছিলেন। সেখান থেকেও রিটায়ার করেছেন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর হয়ে গেল। এখন তাঁর রবিবার সোমবার গুলিয়ে যায়। দিনের ঠিক থাকে না। অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এরকম—একটা দিন দু'ভাগে ভাগ করা। দিন আর রাত। তাদের ভেতর ভোরবেলা আছে। আছে দুপুরে ঘুমোনোর একটা সময়। রাতের ভেতর নিশুতি রাত। যে সময়টায় মাঝেমাঝে ঘুম ভেঙে বিছানায় চুপ করে উঠে বসে থাকেন ব্রজ বাগচি।

এখানে ইঁদারার পাড়ে বসে খিড়কি দিয়ে বাড়ির পেছন দিককার

ফুল বাগান দেখা যায়। গত বর্ষার আগে ফুল দেওয়া বেলিয়ে ঝাড় শীতে কুঁকড়েমুকড়ে পড়ে থাকে। এখন রোদ পেয়ে আড়মোড়া ভেঙে সিধে হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফুল দেবে সেই বর্ষায়। ওখানেই ব্রজ তার খুব বালক বয়সে দেখেছেন—সাজি হাতে বিরাজি ফুল তুলছে। ওখানেই মা পুজোর ফুল তুলতেন। লাবণ্য তোলে এখন ভোর ভোর।

দুই

বিশেষ মেকআপ নিতে হল না। সৌরভ বাগচি বাড়ি থেকেই তৈরি হয়ে আসে। আর এখন শীতের প্রায় সন্ধ্যে। ঘাম কোথায়? ফ্লোরে গিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর নিউজ রিডারের চেয়ারটায় গিয়ে বসলো সৌরভ। সন্ধ্যের নিউজ পড়তে হবে।

ফ্লোর ম্যানেজার এয়ারকণ্ডিশন করা সাউণ্ড প্রুফ স্টুডিওতে ছোট একটা যন্ত্র হাতে বারবার সৌরভের কাছাকাছি গিয়ে আলোর মাপ নিচ্ছিলেন। ভি ডি ও ক্যামেরায় চোখ দিয়ে জিনস্ পরা এক ছোকরা কিছুক্ষণ অন্তর বলছিল—লাইট।

আর অমনি মাথার ওপর ফ্লাড লাইট একটা একটা করে জ্বলে উঠছে।

একটু পরে সৌরভ শুরু করলো। ঘণ্টা দুই পরে পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে টি ভি-তে তার এই ছবি ফুটে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে তার গলা গম্‌গম করে বেজে উঠবে।

আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হল—

কলকাতার গলফ্ গ্রীনের ঝকঝকে স্টুডিও থেকে অনেকদূরে—গাছপালা, নদীনালা পেরিয়ে শীতের সন্ধ্যায় এক জেলা শহরের উকিলপাড়ায় একটি সাবেক পোড়োমত বাড়ির দোতলার ঘরে এক

প্রাচীন দম্পতি একটি টি ভি-র সামনে বসে। টি ভি-র পাশেই এমারজেন্সি লাইট। আচমকা লোডশেডিং হলে এমারজেন্সি লাইট জেবলে দেবেন লাবণ্য।

ব্রজ বললেন, এখনো আসানসোল, বহরমপুর, কার্সিয়াংয়ের রিলে স্টেশন চালু হতে দেরি আছে। বহরমপুর তো কাছেই। তার চেয়ে দ্যাখো না দিল্লি পাও কিনা। নানারকম জীবজন্তুর প্রোগ্রাম দেয় দিল্লী থেকে। দেখলে অনেক কিছু জানা যায়।

কাঁটা নাড়াচাড়া করে কাজ নেই। শেষে ছেলেকে দেখতে পাবেন না সময়মত। যন্ত্রের কথা কে বলতে পারে। যদি বিগড়ে যায়—

আজ কি সৌরভ খবর পড়বে?

তা জানিনে। তবে পড়তেও পারে।

এ কথার পর লাবণ্য বা ব্রজ কেউ কারও মুখে তাকালেন না। ঘর-ভর্তি আগেকার আমলের ঢাউস আলনা, পালঙ্ক। এমনকি ইলেকট্রিকের আলোর টিউবটি থির থির করে কাঁপছে।

টি ভি-র নব ঘোরানো হোল না। শীত এ-শহরে জাঁকিয়ে পড়ে। যেমন কিনা গরমে অস্থির-গরম পড়ে। সারা উকিলপাড়ার ঘরে ঘরে সাবেককালের একজন দুজন করে বুড়ো-বুড়ি পড়ে আছে। ওসব বাড়ি এখন নতুন কালের গুঁড়োগাড়াতেই ভর্তি।

এমন সময় ব্রজ বাগচির ঘরের সামনে খোলা দরজায় কে এসে দাঁড়াল। যমদূত প্রায়। আবছা অন্ধকার। ঢাকা দালানের ডুমটা জবলে না। ঘরেও আলো জেবলে দেয়নি লাবণ্য। এই সন্ধ্যে হয় হয়। তার ভেতর চুল-দাড়িতে ঢাকা বড় একটা মাথা। চোখ দুটো লালচে-কালচে। গায়ে কিছু নেই। বুক ভর্তি লোম। গাছ কোমর করে গোটানো লুঙ্গির নিচে ডেমড়ে কলা গাছের মত দুখানি আদুড় পুরন্ত উরু ওপরের দিকে অনেকটা বেরিয়ে। হাঁটুর নিচে পা যেন আর নেই। দিব্যি সন্ধ্যার আঁধারে মিশে গেছে।

ব্রজ দেখলেন, লাবণ্য এখনো ওদিকে তাকায়নি। সে কিছুই দেখতে

পায়নি। পলকে ব্রজর বুকটা ধক্‌ করে উঠলো। তবে কি সময় হয়ে গেল? লাবণ্যের সামনেই নিয়ে যাবে? নিতে এসেছে আমায়? এটাই তাহলে চলে যাওয়া! এইভাবেই নিয়ে যায়?

কর্মফল—জন্মান্তর—কত কি শুনলাম এতকাল! গীতা ঘেঁটে ঘেঁটে আঙুল ব্যথা হয়ে গেল। যে শ্লোক পড়ি সেটাই মনে হয়—কী মোক্ষম কথা। তার আগের শ্লোক তখন জোলো লাগে। ওদের আত্মীয় ভেবে মারতে দ্বিধা কোরো না অর্জুন। ওদের আমি আগেই মেরে রেখেছি। তুমি তো নিমিত্ত মাত্র। গীতা শুনেছি কালজয়ী সাহিত্য। আমি নেহাত হাবাগোবা। পড়তে গিয়ে ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারি না। নিচের ফুটনোট দেখতে হয়। দেখে মানেটা বুঝে ফের উচ্চারণ করতে যাই। অনুস্বর, বিসর্গ, রেফ্‌, র-ফলার হোঁচোট খেয়ে খেয়ে রসে পৌঁছোনো আর হয়ে ওঠে না আমার। এ সাহিত্য? না. ব্যাকরণ?

ব্রজ বাগচি ফের দরজায় তাকালেন। খাবলা খাবলা মাংস দিয়ে বানানো অতি পুরুষ্টু দাড়িওয়ালা একটা অতিকায় মানুষ দাঁড়িয়ে। আমি তো জ্যান্ত। তবে কি সজ্ঞানে যাচ্ছি? শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন কার্ডে তাহলে সত্যিকথাই লেখে! সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে।

ভয়ংকর কাঁপা গলায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ব্রজ বাগচি। কে? কে ওখানে?

আমি। অতুল—

ওঃ। —বলে ধপাস করে টি ভি-র সামনে ক্লাব চেয়ারে বসে পড়লেন ব্রজ। কাঠের ফাঁক ফাঁক পটি দিয়ে বানানো। বসতে গিয়ে ব্যথা লাগলেও ব্রজ কোনরকম উঃ! আঃ! করলেন না। বেঁচে থাকা যে কি স্বস্তির। আয়েসে আরামখোর গলায় বললেন, সাড়া দিয়ে এসে দাঁড়াবি তো। এতবড় বাড়ি। প্রাণী বলতে মোটে তো আমরা দুজন।

লাবণ্যও ফোঁস করে উঠলেন। হ্যাঁ। যমদূতের মত চেহারা তোর। হঠাৎ দেখলে ভয় পেয়ে যায় লোকে। এখন আঁধারবেলা।

অতুল নামে লোকটি হা হা করে হেসে ফেলল। আমারও তো কম বয়স হোল না বউদিদি। আমায় কি শেষে আজরাইল ভাবলে তোমরা!

ব্রজ বাগচি অতুলকে যমদূতই ভেবেছিলেন। বললেন, কি ব্যাপার?

ওই দক্ষিণের ঘরের বর্গাটা চেরাই হয়ে গেল। এবার বলুন কি বানাতে হবে?

তোমার বানাবার যা ছিরি!

কেন? আপনার সারা বাড়ির চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল তো আমারই বানানো।

এই তো চেয়ারখানা দ্যাখো। বসলেই ব্যথা লাগে।

এখন তো বসলে-শুলে লাগবেই।

কেন? কেন?

বয়স হয়েছে না আপনার। মাংস কমে গেছে শরীরে। যাতেই শোবেন—যাতেই বসবেন—গায়ে ফুটবে কাঠ। এই বয়সে সারা গা শুকিয়ে আসে।

ভেঙিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ব্রজ বাগচি। ওঃ। তোমার বানানোতে বুঝি কোন গাফেলতি নেই?

অতুল ঘরের চৌকাঠেই বসে পড়লো। ছোটখাটো একটি কলাগাছ। বললো, ভুলচুক মানুষেরই হয়। তা বলে টেবিল চেয়ার বেঞ্চে তো ভুল হবার নয়। এমন কিছু ডবল পালঙ্ক তো বানাচ্ছি না। আর যে ঘরই ভেঙে পড়ছে—তারই কড়ি বর্গা দিয়ে নাতি নাতনীদের জন্যে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ বানিয়ে চলেছেন। ক'টি নাতি-নাতনি আপনার?

লাবণ্য বললেন, সৌরভের এক ছেলে এক মেয়ে।

ব্রজ বাগচি যেন সংখ্যাটা কম হওয়ায় লজ্জা পেলেন। বললেন, তাতে কি! ওদেরও তো একদিন ছেলেপেলে হবে।

ততদিনে আপনার নাতি-নাতনিও জোয়ান হয়ে যাবে যে। এই সব চেয়ারে ওরা বসতে পারবে তখন? অতুল আবারও হাসলো। হো হো করে।

হাসার কিছু হয়নি অতুল। ঠিকই বলেছি। নাতি-নাতনিদের ছেলেমেয়েরা বসবে তখন।

তা তাদের জন্যে এতগুলো বানাবেন ? মোটে তো দুটি ছেলেমেয়ে সৌরভদাদার।

দ্যাখো অতুল। মানুষের একটা শখ ! থাকে না ? নাতি আসবে। নাতি ওইসব চেয়ারে বসবে।

এবার অতুল বলল, তা যদি বলেন তো ঠিক আছে। আমি অতুল আলি সর্দার শখের চোটে কলকাতায় দশ বছর কাটিয়ে এলাম। ফিরলাম ফতুর হয়ে।

হ্যাঁ। তুই তো মাঝে উধাও হয়ে গেলি। তাও তো অনেক বছর আগে। ফের এসে অনেকদিন পর একদিন উদয় হলি।

হ্যাঁ। প্রায় চল্লিশ বছর আগে। তখন আমি নওজওয়ান।

লাবণ্য জানতে চাইলেন, তখন তোমার বিয়ে হয়নি ?

হ্যাঁ। বাচ্চাসমেত বিবিকে রেখে কলকাতা চলে যাই একা।

কি জন্যে ? রেস খেলতে নাকি ?

তওবা। তওবা। ঘোড়ার দোষ কোনদিন নেই আমার।

লাবণ্য জানতে চাইলেন, আরেকটি পরিবার রেখেছিলে কলকাতায় ?

তওবা। তওবা বউদিদিমনি। আমার ওই একই বিবি। সাকিনা বড় ভাল মেয়ে।

তাহলে ? —বেশ অবাক হয়েই জানতে চাইলেন ব্রজ বাগচি। বললেন, তোমাদের কয়েক পুরুষ কাঠের মিস্ত্রি। করাত, ছেনি, হাতুড়ি ফেলে উধাও হয়ে গেলে ? কোন উডেন মার্চেন্টের ওখানে কাজে লেগে গিয়েছিলে ?

না। দশ বছর ধরে প্রায় রোজই আমি দু'তিনটে করে সিনেমা শো দেখেছি তখন। —খানিক থেমে বলে, ওই যে বললেন না—শখ। সেই শখ ! হাউস বলতে পারেন।

শখ ? সিনেমার শখ ?

হ্যাঁ। নার্গিসের ছবি অনেক ঘুরে শেষে বাসি হয়ে আমাদের এখানে আসতো। ঠিক করলাম—কলকাতায় বসে নার্গিস এলেই তাকে টাটকা টাটকা দেখবো।

নার্গিস ?

ওই একজন মেয়েছেলে। দারুণ গাইতো। দারুণ পাট করতো। এখন আর দেখা যায় না বড়। যেখানে তার সিনেমা হত—সে চৌরঙ্গীই বলেন আর শ্যামবাজারই বলেন—হেঁটে গিয়ে দেখতাম। পর পর দুই শো—তিন শো। বেরিয়ে এসে হোটেলে খেতাম। আর নার্গিসের বলা কওয়া—নাচগান মনে মনে ভাবতাম। কত ছবিতে তিনি মরে যেতেন। আবার কত ছবিতে তাঁর বিয়ে হয়ে যেতো। মুখে হাসি ফুটতো। মনে মনে বলতাম—সুখে থাকো। সুখে থাকো।

কোথায় থাকতিস ?

বেনেপুকুরে। অনেক কাঠের মিস্ত্রির সঙ্গে একঘরে। মেস করে। তারাই কাজ ধরে দিতো। তা সেসব কাজ রাখতে পারতাম না।

কেন ?

চলে যেতো। যে কোন কাজে কথা দিলে সময়মত যাওয়া দরকার।

সে তো নিশ্চয়।

যেতে পারতাম কোথায়! রাস্তায় নার্গিসের পোস্টার দেখলে পড়ে দেখে সেই সেই হলঘরে ছুটতাম।

পড়তে পারিস ? আর ক'টাই বা ছবি একজনের থাকতে পারে! নার্গিস তো সব ছবিতে থাকতেন না।

বড় লেখা পড়তে জানি। তাতে কি ? শ্যামবাজারে থামায় যে-ছবি দেখলাম—সে ছবিই আবার হাজরায় বসুশ্রীতে গিয়ে দেখেছি।

একই ছবি ?

হ্যাঁ। ভাবতাম—দেখি না—এক জায়গায় দেখলাম—দেখি আরেক জায়গায় কেমন দেখায়! তা সব জায়গাতেই একরকম দেখাতো। একই-

ভাবে সব জায়গায় গাইতো—একই গান— নাচও —কথাও তাই তাই। ঝগড়াঝাটি, কান্নাকাটিও তাই। আমাদের মত এক এক জায়গায় এক একরকম ব্যাভার নয়।

লাবণ্য হাসিতে ভেঙে পড়লেন। তুই থামতো! বলতেও পারে—

তাইতো করতাম বউদিদিমনি। নার্গিসকে দেখে দেখে বেড়াতাম। দিনের বেলায় ভিড়ের ভেতর বসে বসে তার স্বপ্ন দেখতাম! এই করে কাজ গেল। কেউ আর কাজ দেয় না। শেষ শো দেখে বেশি রাতে ভুল ট্রামে চড়ে বসেছি কত। শেষে হেঁটে হেঁটে উল্টোমুখে ফেরা। হোটেলের পচা ভাত খাওয়া। একদম ফতুর হয়ে ফিরলাম।

ব্রজ বাগচি মনে মনে বললেন, সৌরভেরও তো সেই একই হাউস। অ্যাকটিং করবে! সারা দেশ মুগ্ধ হয়ে তার অ্যাকটিং দেখবে।

তিন

সন্ধ্যেবেলা শ্রীধরকে লাবণ্য গুড় আর দুধ দেন। দুধটা গরম করেই দিচ্ছিলেন। এখন এই ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডা দুধ খেলে বুকে ঠাণ্ডা বসে যেতে পারে শ্রীধরের। দুধ গুড় দেবার পর পুরুতমশাই ঘন্টা নেড়ে আরতি করবেন। তারপর মশারির ভেতর শ্রীধরের শয়ান হবে। গায়ে লেপ উঠবে। যা মশা এখন শহরে—মিউনিসিপ্যালিটি মশা মারার তেল বিশেষ ছেটায় না। আগেকার সব ড্রেন বুজে এসেছে। বর্ষায় জল-নিকাশের নাম নেই। অথচ ভোট চাই। শয়ান দেবার পর মশারি টানিয়ে দেওয়া হবে। অন্ধকারে লেপ গায়ে শ্রীধর ঘুমোবেন।

এই রান্নাঘর লাবণ্য এ-বাড়িতে সত্তর বছর আগে আট বছরের বউটি হয়ে এসে প্রথম দেখেন। তাঁর শাশুড়ি তাঁকে বাটি বাটি গরম দুধ খাইয়েছেন। সতেরো-আঠেরো বছর বয়স হবার আগে তাঁকে এ-ঘরে ঢুকতে দেননি তিনি। পাছে অসাবধানে হাত-পা পুড়ে যায় লাবণ্যের।

এখন এই সন্ধ্যেরাতে কী নিশ্চুতি বাড়ি। একটা আওয়াজ নেই। দূরে বড় রাস্তায় বাসের হর্ন। আর বাড়ি বাড়ি দোর আটকে পালঙ্কে বসে টি ভি দেখা।

রান্নাঘরের পাশেই শ্রীধরের ফুলবাগান। গোটা সাতেক নারকেল গাছ। একটা জামরুল গাছ। এখন আর ফল দেয় না। গাছটার সারা গায়ে দয়ার গুঁড়ো। ফাংগাস না কি বলে। একবার গায়ে লাগলে ভীষণ চুলকোয়। গা দাগড়া-দাগড়া দিয়ে ওঠে। গাছটা কাটানো দরকার। অনেকটা জায়গা জুড়ে ঝুপসি হয়ে থাকে। পেছনের চাটুজ্যে বাড়িও বিশেষ লোক নেই। দিনের বেলা কোন দুষ্টু লোক গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে রাতে চুরি করতে পারে। কিন্তু গাছটা প্রাণে ধরে কাটতে দিতে পারেননি লাবণ্য। ব্রজ বাগচি কাটাবেন বলে ক্ষেপেছিলেন। লাবণ্য কাটতে দেননি। বলেছেন—থাক না। কতকাল আছে। সৌরভ হবার পর বসানো। বাবা ঝাউদিয়া থেকে এনে বসিয়েছিলেন। কলমের গাছ।

আমরা চলে গেলে পরে এ-গাছে শকুন বসবে। সাপে বাসা বেঁধেছে কিনা কে জানে। কতরকম গর্ত গাছটার গায়ে দেখেছো লাবণ্য।

থাক না গর্ত। গর্তে থাক না সাপ। এতদিন আছি আমরা—আমাদের তো কেউ কামড়ায়নি।

দুধ গরম করতে করতে লাবণ্যর একবার মনে হল—বাবা বেঁচে আছেন। শ্বশুর মশায়ের মক্কেলরা বারান্দার বেঞ্চে বসে। ব্রজ বাগচি টাউন ক্লাবে এইমাত্র থিয়েটারের মহলা দিয়ে ফিরলেন। কলকাতা থেকে প্লেয়ার আসছে। কম্বিনেশন নাইটে 'পি ডব্লু ডি' নাটকটা হবে। সবাই নাকি অহীনবাবু, আর বি গুপ্ত, দুর্গাদাসের কপি করতেন। ব্রজ বাগচি হেসে হেসে বলছেন, আমি কারও কপি করায় নেই। কপি করলে ব্রজ বাগচিকেই কপি করবো। কি বল লাবু—

গর্বে সেদিন তাকাতে পারেননি লাবণ্য। সন্ধ্যেরাতে খোলা বারান্দায় একফালি জ্যোৎস্না। সামনে দুর্গা পুজো। তাঁর স্বামী থিয়েটার কি

টকির দুর্গাদাস না হোন—ব্রজ বাগচি তো বটে। তাই বা কম কি? লম্বাপানা—কালোর ওপর টানটান চেহারা। একমাথা কালো চুল। কথা বললে গমগম করে। হাসলে তেজ উপচে পড়ে। তঁর স্বামী তিন বোনের পর একমাত্র ভাই। সেই ভাইয়ের বউ হল গিয়ে লাবণ্য। কম কথা! তাঁর স্বামী এম এ, বি এল। কোর্টে বেরুচ্ছে। নিজেরই বাবার জুনিয়র। পায়ের কালো পাম্পসু-তে জ্যোৎস্না পড়েছে।

যাই ছোড়দি—বলে একা একাই নিঃঝুম রান্নাঘরে হাসিতে উচ্ছ্বসিত লাবণ্য চেঁচিয়ে উঠলেন। চেঁচিয়েই থেমে গেলেন তিনি। এ অন্য সময়। অন্য কাল। উঃ সেসব দিন কি-ই না গেছে। তাঁর স্বামীর ছোড়দি পুজোর আগে লটবহর নিয়ে এসেছে। সঙ্গে ঠাকুরজামাই। ঠাকুরজামাই ঘন ঘন চা চাইছেন। চেঁচিয়ে বলতে পারছেন না। তিনি ছোড়দিকে খোঁচাচ্ছেন। ছোড়দি ডাকছেন, ও লাবু- হোল—এদিকে যে তোমার ঠাকুরজামাই অস্থির।

অমনি লাবণ্য রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠতেন। যাই ছোড়দি -

তখনো বড়দি, মেজদি এসে পেঁছিননি। সবাই এসে পড়লে সে কি আনন্দ। একদিন বাড়ির মেয়েরা ঘোড়ার গাড়ি চেপে সবাই মিলে টকি দেখা হোল। সেসব খরচ খরচা ব্রজ বাগচির জামাইবাবুদের।

লাবণ্য বাড়ির সেই জামাইদের যেন চোখ বুজে দেখতে পাচ্ছেন। বড়জামাই—ভৌমিকমশায়—গলায় চাদর। নগদ একাশি টাকা দিয়ে ভিষগরত্ন উপাধি কিনে দেন। শেষে তো বড়দিকে নিয়ে তিনি এখানেই উঠে এলেন। খড়ের তীরে—যেখানটায় এখন মোহিতনগর—সেখানে কাঁচা ঘর তুলে ভৌমিক মশায়ের কারখানা করা হল। বড় বড় কড়াই। উনুন। গাছগাছড়া। শিশি বোতলের ছড়াছড়ি। ঐশ্বর্যময়ী ঔষধালয় —সাইনবোর্ডটি ঝুললো সেখানে। ভৌমিক মশায় দেখতে খুব সুপুরুষ ছিলেন। বিয়ের পর মোহিত বাগচিই তাঁকে আয়ুর্বেদ পড়ান।

লাবণ্যর কেমন ঘোর লেগেছিল। দুধটা চলকা দিয়ে উঠেছে। এমন সময় কে তার আঁচল ধরে টানলো।

অমনি লাবণ্য চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, দিচ্ছি। দিচ্ছি। একদম তর সয় না। একটু ঠাণ্ডা করে খেও। নয়তো ঠোঁট পুড়ে যাবে শ্রীধর—

ইদানীং চোখে কম দেখেন লাবণ্য। তাঁর খসে পড়া আঁচলে বাড়ির হলুদপনা মোটা-সোটা বেড়ালটি তার লেজ আকসি করে বাঁধিয়ে নিয়ে লাবণ্যের গায়ে হালকা একটু হেলান দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছি—আমি আছি। আমিও আছি। সব দুধটুকুই তোমাদের শ্রীধরকে দিওনা যেন।

লাবণ্য বেড়ালকে একদম দেখতে পাননি।

ব্রজ বাগচি দোতলার বড় ঘরখানায় টি ভি-র সামনে সেই অতুল আলির বানানো স্পোর্টস্ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে। বিরাট ডবল পালঙ্কে জোড়াবিছানা। টি ভি-টাকে ঘিরে নানা সাইজের চেয়ার পাতা। কিন্তু বসার কেউ নেই। পোড়ো—ধসে পড়া ঘরগুলোর কড়িবর্গা—জানলা দরজার কাঠ দিয়ে সারা বছর টেবিল চেয়ার তৈরি হচ্ছে।

ব্রজ বাগচি দেখলেন, তাঁর একমাত্র ছেলে সৌরভ বাগচির মুখখানি টি ভি-তে ফুটে উঠলো। ঢলো ঢলো ভাব। মাথার ডান পাশ দিয়ে সিঁথি। লাবণ্যর নাক পেয়েছে। মাতৃগঠিত মুখ। এসব সন্তান নিজের মত করে সুখী হয়। অন্যদের সুখ দিতে পারে না। বড়—ভাসাভাসা চোখ। এই আশ্বিনে সৌরভের চুয়াল্লিশ পূর্ণ হয়েছে। আমার মা অনেক জায়গায় ঢিল বেঁধে—অনেক মানত করে তবে এই নাতি পেয়েছিলেন। সবাই ধরেই নিয়েছিল—লাবণ্যর বুঝি আর কিছু হওয়ার নয়। আমার তখন চল্লিশ। জজকোর্টে মামলা নিয়ে দাঁড়ালেই ষোল টাকা পাই।

সৌরভ বাগচি শুরু করলো। যেন কারও দিকে তাকিয়ে নেই। অথচ সবাই মনে করছে—তারই দিকে তাকিয়ে। টি ভি-র এই এক মজা।

আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হোল :

ব্রজ দেখলেন, তাঁরই দিকে তাকিয়ে সৌরভ কথাগুলো বললো।

অমনি তিনি সৌরভের মুখে সরাসরি তাকিয়ে ভেঙিয়ে উঠলেন। আ-হা-আ ! আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হল—

আমি আমার বউয়ের কথায় বুড়ো বাবা মাকে ফাঁকা বিরাট বাড়িতে একা ফেলে রেখে কলকাতায় গিয়ে উচ্চিংড়ে হয়েছি।

টি ভি-তে সৌরভ তখন বললো, সারা দক্ষিণে নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্বে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সরেজমিনে দেখে এসে সহকারী নির্বাচন কমিশনার ডক্টর ভাল্লা বলেছেন, তিনি সন্তুষ্ট।

এবার সৌরভের মত অবিকল গলা করে ডবল ভেঙিয়ে উঠলেন ব্রজ বাগচি। আ-হা-হা-আঃ ! আঃ—হাঃ ! ভেঙাবার সময় কাঁধ থেকে তাঁর সাদা মাথাটি টি ভি-র দিকে খানিকটা এগিয়ে গেল।

আমি নিজে সরেজমিনে তোমার দত্তবাগানের ফ্ল্যাট দেখে এসেছি। দেখে একটুও সন্তুষ্ট হইনি। না বসা যায়। না শোওয়া যায়।

ঘরের কোণে ঢাউস আলনায় হেলান দিয়ে স্বপন এতক্ষণ ঢুলছিল। সারাদিন কম হুজ্জোত যায়নি তার। দাদু-দিদিমা দুপুরের ভাতঘুমে ঢলে পড়লে সে এই এতবড় বাড়িতে খবরদারি করে বেড়ায়। অতুল আলি যেখানটায় বসে তার সাকরেদ নিয়ে র‍্যাদা চালায়—সেখানে গিয়ে স্বপন একা একা কাঠের চোকলার স্তূপ দেয়। সন্ধ্যে হলে ধুনুচিতে সেগুলোই ঠুসে আগুন লাগায় সে। তারপর ধুনো ছড়ায়। ছড়িয়ে ঘরে ঘরে ধোঁয়া দেয়। নয়তো মশা তিষ্ঠোতে দেয় না। কতকগুলো ঘরে সে ঢোকেই না। বড় বড় ঘর। মাঝখান থেকে ছাদটা ঝুলে পড়েছে। যে কোনদিন ধসে পড়বে। কোন পাগল এই বাড়ি বানিয়েছিল-সে ভেবেই পায় না। তার কত লোক ছিল যে এতগুলো শোবার ঘর। দাদুর দাঁত কিড়মিড়—আর টি ভি-তে সৌরভদাদার মুখে তাকিয়ে দাদুর অমন ভেঙানো দেখে তো তার চক্ষুস্থির। একটু মজাও পাচ্ছিল। দ্যাখো দ্যাখো—বাপ হয়ে নিজের ছেলেকে কেমন ভেঙায় ! সে হাসবে ? না, কাঁদবে ? বুঝে উঠতে পারে না স্বপন।

ব্রজ বাগচি তখন ভেঙাতে ভেঙাতে বললেন, পায়রার খুপরি, দুখানি

ছোট ছোট ঘর। অথচ নিজেদের এতবড় বাড়ি পড়ে রয়েছে। সেখানে থাকা যায় না! অ্যাক্টর হবেন বাবু। অ্যাক্টর। টি ভি-তে দেশসুদ্ধ লোক মুখ দেখবে। তা অভিনেতা হবার ইচ্ছে যখন—তখন এখানে আমাদের কালের সাবেক ক্লাব নাট্য নিকেতনকে ফের বাঁচিয়ে তুললেই হোত। দুর্গাদাস—দুর্গাদাস যে অত বড় অ্যাক্টর—তখনকার বিলিতি কাগজে লিখেছিল—এশিয়ার ডগলস ফেয়ারব্যাঙ্কস! তিনিও তো তাঁর গাঁয়ের বাড়ির যাত্রা থিয়েটারে পাট করেই শেষে কলকাতায় উঠে এসেছিলেন। ভিনি, ভিডি, ভিসি। প্রথমে থিয়েটারকে জয় করলেন। তারপর টাকিকে। আর তুমি! আমার একমাত্র ছেলে—

স্বপন দেখলো, দাদুর গলা বুজে গেছে। টি ভি-তে সৌরভদা সময় ফুরিয়ে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি বলে যাচ্ছে—

অকুস্থল থেকে পঞ্চাশ মাইলের ভেতর সবরকমের নার্সিং হোম, হাসপাতালে গিয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ব্যুরোর লোকজন খোঁজ নিচ্ছেন—ওই কালো দিনে আহত কেউ ভর্তি হয়েছিল কিনা—হয়ে থাকলে সে কোথায়—তার ঠিকানা কি লেখা আছে। কেন না, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর আততায়ী শুধু একজনই ছিল না। শুধু একজনই আত্মঘাতী হয়নি। গোয়েন্দাদের সন্দেহ—আততায়ী ছিল তিনজন। তার ভেতর শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয়েছে দু'জন। আরেকজন আহত অবস্থায় পালিয়েছে। সে নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও নিজের চিকিৎসা করিয়েছে।

ব্রজ বাগচি বললেন, আমি কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে আর ছেলের বিয়ে দেব না।

স্বপন হাঃ! হাঃ! করে হেসে উঠলো, ও দাদু। তোমার আর ছেলে কোথায়? ছেলে তো মোটে একটা! আর বে দেবে কি? বউদিদি তো মরেনি। এখন সৌরভদার ফের বে দিলে পুলিস এসে ধরে নেবে না?

ব্রজ বাগচি স্বপনের কথা শুনতেই পেলেন না। তিনি বলে চলেছেন: সুন্দরী, সুশ্রী গৃহকর্মনিপুণা! কত কথাই দেয় বিজ্ঞাপনে।

বিয়ে হয়ে এসে প্রথম কাজ ছেলেকে আলাদা করা। স্বামী অ্যাক্টর হবে তো কলকাতায় যাওয়া চাই। সেখানে বিকাশের কত রাস্তা। ওগো ওখানে গেলে তোমায় লুফে নেবে। নিয়েছে? ক'বছর তো ঘষছিস টি ভি তে। টুক-টাক দুমিনিট তিন মিনিটের অভিনয়ের চান্স। সেজন্যে কলকাতায় পায়রার খুপরিতে পড়ে থাকা। আর ওই মাইনেতে? সৌরভ! তুই এখানে থাকলে আমি রহমতপুরের সাতাশ বিঘে বেচতাম না। অমন সারি জায়গা কেউ বেচে? দিব্যি তামাক দিতিস দশ বিঘেয়। তোর দু'বছরের মাইনে হয়ে যেতো এক মরশুমের চাষে। তারপর আমাদের সাবেক ক্লাব নাট্য নিকেতন নিয়ে থাকতিস। তোর মত ছেলে এখানে নাটক নিয়ে মাতলে শহরে জোয়ার আসতো। তোর ভয়েস আছে। চেহারা আছে।

টি ভি-র পর্দায় সৌরভ বাগচি যেন তার বাবার কথা সব শুনতে পেয়েছে। লাজুক লাজুকভাবে অল্প হেসে বলল, এখনকার মত সংবাদ এখানেই শেষ হল। বলেই সৌরভ বাগচি যেন খুব নিষ্প্রভ হয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

স্টুডিওর বাইরে এসে সৌরভ দেখলো, গলফ্ গ্রীনে টি ভি সেন্টারের সামনের লনে আলো জ্বলে উঠেছে। দূরদর্শনের অফিস ঘরগুলোতে আলো। এতক্ষণ কি সুদর্শন ঘোষ থাকবেন? বিকেল পাঁচটাতেই তো তাঁর অফিস শেষ। তবু লিফ্‌টে তেতলায় উঠে গেল সৌরভ।

টি ভি সিরিয়ালের চিত্রনাট্য জমা পড়েছে শয়ে শয়ে। তার স্ক্রিনিং কমিটির মাথায় সুদর্শন ঘোষ। তিনি ঘরেই ছিলেন। সৌরভ ঢুকতেই বললেন, না। ভায়া তোমার ওই স্ক্রিপ্ট পাশ করা গেল না। বড্ড পানজেন্ট। হিউম্যান স্টোরি চাই।

চার

এই জেলা শহরে ছেলেদের মেয়েদের আলাদা কলেজ। শহরের বুকের ওপর দিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে লরি যায় শিলিগুড়ি, গৌহাটি, মিজোরাম—কোথায় নয়? তাছাড়া বাস যাচ্ছে শিকারপুর, করিমপুর, নাকাশিপাড়া। আবার কলকাতাও যায়। আছে পুলিস লাইন, হাসপাতাল, নার্সিংহোম, জেলাপরিষদ ভবন, ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি। এমনকি একটা বাড়ির গায়ে তেরছা হয়ে ঝুলে থাকা সাইনবোর্ডে লেখা আছে—টাক্কাভি লোন অফিস। ঠিক রেল স্টেশনে যাবার রাস্তায়—বাঁ হাতে।

সুতরাং এরকম জেলাশহরে জেলখানাও থাকবে। খড়ে নদীর তীরে সেই জেলখানায় অন্ধকার শীতের রাতে পরপর দুটো ঘণ্টা বাজলো।

তার মানে এখন রাত দুটো।

উকিলপাড়ার বাগচিধাম থেকে খুট খুট করে একটি ছেলে বেরিয়ে এল। নিশুতি রাত বলে চলাফেরায় কোন ভয়-ভীতি নেই। কাছা দিয়ে ধুতি পরেছে। গায়ে কিছু নেই। মাথার চুলটি চুড়ো করে বাঁধা। এটা যে শীতের রাত—তার হাবেভাবে বোঝার উপায় নেই কোন। শহরের ফাঁকা রাস্তা দিয়ে যেন তরতরিয়ে চলেছে। হঠাৎ দেখলে স্বপন বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু স্বপন তো হাফপ্যান্ট আর হাফশার্ট পরে।

বড় রাস্তায় পড়তে বোঝা গেল—ছেলেটির বয়স এই বছর বারো-তের। রাস্তায় আলোর খুঁটির সামনে এলে তাকে দেখা যায়। আবার দুই খুঁটির মাঝখানে পড়ে গেলে অন্ধকারে তাকে আর দেখা যায় না।

বাসগুমটি পেরিয়ে সংচাষীপাড়ার মুখে তে-মহলা বাড়ির সামনে এসে ছেলেটি দাঁড়ালো। বাসের দু'জন হেল্পার ক্লিনার বেশি রাতে চোলাই গিলে একটা বুড়ো খিরিশ গাছের এবড়ো-খেবড়ো শেকড়ের ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

বাড়িটার গায়ে লেখা সান্যাল নিবাস। ছেলেটি ডাকতে লাগলো, ও গোপাল ? গোপালরে—

সান্যাল-নিবাসের ছোটমত লোহার গেটটা খুট করে খুলে গেল। পাশেই একটা শিউলি গাছ সারা রাত ধরে সুগন্ধী সাদা ফুল টুপটাপ মাটিতে ফেলে যাচ্ছিল। একটা বছর সাতেকের ফুটফুটে ছেলে মুখে আঙুল চেপে চাপা গলায় বললো, চুপ। আস্তে শ্রীধরদা। মেজোকর্তা জেগে যাবে যে—

জাগুকগে! এত ভয় কিসের ? আমরা কারও পরোয়া করি নাকি!

না। মানে মানুষটা বুড়ো হয়েছে তো। এখন জেগে গেলে সারা সকাল মাথা ধরায় কষ্ট পাবে।

থাক একটু। এমনিতেই তো বুড়ো ঘুমোয় না। ভোর চারটেয় মাঙ্কি ক্যাপ পরে হাঁটতে বেরিয়ে যায়—

এত আগে ঘুম ভাঙলে কষ্ট পাবে শ্রীধরদা—

ওঃ! খুব ভজিয়েছে তোকে।

না। তা নয়। তবে মেজোকর্তা মানুষটা আমার বড্ড ন্যাওটা হয়ে পড়েছে—বলতে বলতে গোপাল নামে ছেলেটি বাসগুমটি অব্দি হেঁটে এগিয়ে এসেছিল।

শ্রীধর নামে কিশোরটি তাকে থামালো। বলল, যা গেটটা বন্ধ করে দিয়ে আয়। চোর ঢুকবে শেষে—

কি আর নেবে! গেট তো সারাদিনই খোলা থাকে। ক'টা ফুল নিতে পারে।

তাও বন্ধ করে দিয়ে আয়। পুজোয় ফুল শর্ট পড়লে শেষে তোর মেজোকর্তাই কষ্ট পাবে।

তবে যাই আটকে দিয়ে আসি। —বলতে বলতে গোপাল একছুটে সৎচাষীপাড়া রোডে ঢুকে পড়লো। ফিরেও এলো পলকে।

শ্রীধর আর গোপাল হাঁটতে হাঁটতে ফের বড় রাস্তায়। শ্রীধর বলল, গোপাল। তুই মেজোকর্তার জন্যে খুব চিন্তা করিস। তাই না ?

তা করি। দু'বেলা বাল্যভোগ দেয়। দোলে আবির দেয়। মাঝে তো সান্যাল নিবাসের বাকি সবাই চাইছিল—আমায় লোকাল কালী-বাড়িতে ওই গোমুখ্খু সেবাইয়েতটার কাছে চালান করে দেওয়া হোক। এজমালিতে সেবা—এজমালিতে ভোগ।

ওখানে গেলে তো কিছুই জুটতো না। পচা ফুলবেলপাতা ফেলার আদাড়ে ফেলে রাখবে।

একবার ওখানে চালান করে দিলে কপালে তাই জুটতো শ্রীধরদা। তা মেজোকর্তা রুখে দাঁড়াল। বললো, গোপাল কোনদিন ওখানে যাবে না। গোপালের নামে সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা আছে। সেই টাকায় তার বাল্যভোগ, শেতল, মাথার লক্ষ্মীবিলাস যেমন চালু আছে তেমন চালু থাকবে।

নেদেরপাড়ায় ঢুকে বাঁ হাতে তিনখানা বাড়ির একখানি ছিমছাম একতলা। তার গায়ে সাইনবোর্ড। তাতে লেখা—এখানে যত্ন সহকারে মাধ্যমিকের সব সাবজেক্ট সুলভে গ্যারান্টি দিয়া পড়ানো হয়। বাড়িটার ছাদ থেকে পোড়ামাটির নল বেরিয়ে আছে। শ্রীধর দেখেই বুঝলো, জলছাদ করার পয়সা হয়নি মাস্টারমশায়ের। তাই সস্তায় নিকাশী পাইপ বসানো। পাছে বর্ষায় জল বসে ছাদে।

বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীধর চাপা গলায় কথা বলতে লাগলো। বললো, সারাদিন ছাত্র ঠেঙিয়ে বেশি রাতে শুয়েছে মাস্টারমশাই। তার ওপর সারাদিন নন্দর মত ছোকরাকে সামলানো আছে।

গোপাল বলল, তাহলে নন্দদাকে আস্তে ধীরে ডাকো শ্রীধরদা।

তা ডাকছি। তার আগে তোকে একটা কাজের কথা বলি। —বলে শ্রীধর দেখলো, গোপাল তার মুখে বালকের সরল বিস্ময়ে তাকিয়ে। শোন্। আমি তোর চেয়ে একশো বছরের বড়।

একশো বছর?

হ্যাঁ। আমার এই আটশো। তোরও তো সাতশো হবে হবে।

গোপাল রীতিমত বিস্মিত। সাতশো বছর হয়ে গেল?

হ্যাঁ গোপাল। সাতশো। একটা কথা বলি। কোথাও মায়ায় বাঁধা পড়িসনি। আমরা হলাম গিয়ে বর্ষায় গণ্ডকের বুকে পাহাড় থেকে ভেসে আসা পাথর। শুখোর সময় জল নেমে গেলে ধু ধু বালির ভেতর মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকতাম। মানুষ তো খুব স্বপ্ন দেখে। ওরাই কুড়িয়ে এনে আমাদের চান করায়—ভোগ দেয়—আরতি করে—মশারি টাঙায়—আবার গন্ধ তেলও মাথায়। ওরাই আমাদের ভগবান করেছে।

গোপাল চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল।

শ্রীধর বলল, তাই বলছিলাম—কোথাও মায়া বাড়াতে নেই। ওরা তো ওদের স্বপ্নমাফিক আদিখ্যেতা করে যাবেই। তাই বলে আমরা জড়াবো কেন? সেবারে মনে নেই—সান্যালদের একতরফ—আরে সেই যে জন্মেঞ্জয় সান্যাল—ভুরিশ্রেষ্ঠ গাঁয়ে—

ভুরিশ্রেষ্ঠ?

হ্যাঁ। এখন যাকে বলে ভুরশুট। সেই গাঁয়ে হাটবারে একদিন সন্ধ্যেয় মগরা নৌকো করে এল। আগ্রায় তখন শাহজাহান বাদশা। মগরা এসেই জোয়ান দেখে দেখে মেয়েপুরুষ লুট করে নিলে গেল সব। যুবতী মেয়েদের বেচে দিত ওরা। জোয়ান মরদদের চাবুক মেরে ওদের নৌকোয় বৈঠা বাইতে বাধ্য করতো।

হ্যাঁ। হ্যাঁ মনে পড়েছে। বুড়ো জন্মেঞ্জয় আমায় বড় ভালবাসতো। তিন মেয়ে ছিল তার। রূপমঞ্জরী, কর্পূরমঞ্জরী, শৈবলিনী। তিন তিনটে মেয়েকেই মগরা নিয়ে গেল। জন্মেঞ্জয় গভীর রাতে তার কুলপঞ্জিতে তিন মেয়ের নাম লিখে পাশে লিখলো—এতে মগেন নীতাঃ। তারপর আত্মঘাতী হবার জন্যে দু'হাতে আমায় মাথায় নিয়ে নদীতে ডুবে মরতে চললো।

সেদিন বুড়োর সঙ্গে তুইও গোপাল নদীতে তলিয়ে যেতিস। ফের আর গোপাল হয়ে ওঠা হোত না তোর কপালে। ভাগ্যিস নদীতে যাবার পথে অন্ধকারে বুড়োর মাথা থেকে পড়ে কচুবনে হারিয়ে গিয়েছিলি।

বুড়ো তো ডুবে গেল শ্রীধরদা। সান্যাল বুড়োর নাতি আমায় খুঁজে পেয়েছিল কচুবন থেকে—পঞ্চাশ বছর পরে—খেলতে খেলতে।

হাসালি গোপাল! নাতি কোথায় পেলি? বুড়োর তো তিন মেয়ে ছিল। ছেলে ছিল না তো।

রূপমঞ্জরী কয়েক বছর পরে ফিরে এসেছিল শ্রীধরদা।

তাই?

শ্রীধরের একথায় মাস্টারমশায়ের একতলার অন্ধকার বারান্দা থেকে একটা গলা ভেসে এল। হ্যাঁ শ্রীধর। রূপমঞ্জরী ফিরে এসেছিল। অনেক বছর পরে। অনেক ঘাটের জল খেয়ে।

শ্রীধর দেখলো, তার চেয়ে কিছু লম্বা ছোকরা মত একটি ছেলে একফেরতা দিয়ে ধুতি পরে দিব্যি খালি গায়ে বারান্দার অন্ধকারে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। তবে মাথায় ঝুঁটি করে বাঁধা চুলে ময়ূরের একটি পালক গোঁজা!

ওঃ! নন্দ। তাই বল।

নন্দ বললো, রূপমঞ্জরী যখন ফিরে এল—তখন জন্মেঞ্জয় সান্যালের ভিটেয় ঘুঘু চরে। সাপের আড্ডা। রূপমঞ্জরীর রূপ তখন ফেটে পড়ছে। পাঁচ ছ'মাসের পোয়াতি। সান্যালদের অন্য শরীকরা রূপমঞ্জরীকে নিল না। সমাজও নিল না। তবে তার বাপের ভিটেয় তাকে থাকতে দিতে কেউ বাধাও দিল না। খোকা হল একটি গোরাপনা। সেই খোকা বড় হয়ে মায়ের কুঁড়েঘর পাকা করলো। দালান দিলো। দিঘি কাটলো।

শ্রীধর বললো, কি করে?

গোপাল বললো, ব্যবসা করে। বাণিজ্য করে। সেই খোকাই তো খেলতে খেলতে আমায় খুঁজে পেয়েছিলো কচুবনে। বড় সুশ্রী।

নন্দ বললো, হবে না। বাইরের রক্ত তো।

শ্রীধর বললো, ওঃ! তাই সান্যালরা এত সুন্দর দেখতে—

নন্দ অন্ধকার বারান্দা থেকে উঠে হেঁটে আসছিলো। আসতে আসতে জানতো চাইলো, গোপালকে কী বোঝাচ্ছিলি শ্রীধর?

শ্রীধর মুখ তুলে চাইলো। দেখলো—নন্দর নাকের নিচে কালো করে গোঁফের রেখা। তার চেয়ে দু'এক বছরের বড়ই হবে নন্দ। মুখে বললো, এমন কিছু না। এই মায়া—

পাঁচ

দত্তবাগানে সরকারী ভাড়ার ফ্ল্যাটে একেবারে গোড়ায় চাকুরে যাঁরা ভাড়া এসেছিলেন তাঁরাই এখনো বেশির ভাগ ফ্ল্যাট নিয়ে আছেন। ওঁরা যখন দেড়শো দুশো টাকার ভাড়ায় এসব ফ্ল্যাটে উঠে আসেন—তখন ওঁদের মাস মাইনে হাজারের ভেতরে ছিল। তারপর অনেকগুলো পে-কমিশনে বেড়ে বেড়ে ওঁদের অনেকেরই মাস মাইনে এখন চার হাজার, পাঁচ হাজারের ওপর। কারও কারও আরও অনেক বেশি। ভাড়া কিন্তু সেই একশো দশ টাকা, একশো আশি টাকাই আছে। দুই ফ্ল্যাটবাড়ির মাঝের ফাঁকা জায়গায় এখন অনেকের নিজের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। যারা চাকরির ওপর ছোটখাটো ব্যবসাও করে—তাদের বাড়ির মেয়েরা বিয়ে পৈতেয় যাবার আগে পারলার ঘুরে যায়। কাশ্মীরে শান্তি থাকতে কেউ কেউ খিলেনমার্গে বেড়াতে গিয়ে 'স্কি' করে এসেছে।

এরকম জায়গায় সৌরভ বাগচি তার দোতলার ফ্ল্যাটের জানলা দিয়ে একফালি আকাশে তাকিয়ে আছে। ছেলে বিকাশ ক্লাশ এইটের ইংরেজী ভূগোল থেকে কাশ্মীরের লে-র বৌদ্ধ মঠের কথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে। মেয়ে অনুভা ক্লাশ টেনের ক্লাসফ্রেণ্ডদের লেখা কবিতাগুলো রোল অনুযায়ী সাজাচ্ছিলো। ম্যাগাজিনের জন্যে জমা পড়েছে। সাজিয়ে দিলে পরে ম্যাগাজিন দিদিমণি পড়ে দেখে তবে সিলেক্ট করবেন। ওদের মা রমা দেড় লিটারের প্রেসার কুকারে ছ'শো

পাঁঠার মাংস চাপিয়ে দিয়ে শিসের অপেক্ষায়। পৃথিবী যেন বিরাট কোন ঘটনা ঘটার আগে থম মেরে আছে। প্রেসার কুকারে ফার্স্ট হুইসল পড়লেই সেইসব ঘটনা ঘটতে শুরু করবে। বিকাশের ভেতরকার খিদের ইচ্ছে—অনুভার অনিচ্ছা—সৌরভের কাজ সেরে নেওয়া গোছের খাওয়া আর রমার ছোট একটি টেবিলে সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে খেতে বসা শুরু হয়ে যাবে।

এই শীতের দুপুরে আজ সবাই বাড়িতে। স্কুলগুলোতে কিসের ছুটি বলে বিকাশ আর অনুভা বেরোয়নি। রমা যে স্কুলে পড়ায়—সেখানে নতুন বিল্ডিং হবে। তাই আজ থেকে তিনদিন ছুটি। সৌরভ সন্ধ্যের আগে একবার টিভি স্টেশনে যাবে। কয়েকটা টেলিফিল্ম স্ক্রিনিং করে দেখা হচ্ছে। আপত্তির কিছু থাকলে শেষবারের মত বদলাতে বলা হবে। এইসব স্ক্রিনিংয়ে গিয়ে আজকাল সৌরভ বসে থাকে। বসে থাকলে অনেক কিছু শেখা যায়। অনেক জানা যায়। দেখতে দেখতে মাথায় আইডিয়া আসে।

সৌরভ বারবার ভাবছিল—হিউম্যান স্টোরি আসলে কি? ওঁরা বলেছেন, সৌরভবাবু যে স্ক্রিপ্ট দিয়েছেন—তা চলবে না। নতুন কিছু দিন। যাতে কিনা স্ট্রং হিউম্যান স্টোরি থাকবে—অথচ দেখে একবারও মনে হবে না—এটা কোন প্রচার। জনগণের যেসব প্রতিষ্ঠানে আস্থা—তার কোনটিকেই যেন কোনমতে আঘাত না করা হয়।

মা বাবা বুড়ো হয়ে গেছে। আমি তাদের কাছে গিয়ে থাকতে পারি না। অতটুকু জেলা শহরে আমাকে এই মাইনের চাকরি কে দেবে! আমি ওখানে গিয়ে থাকলে বিকাশ আর অনুভার পড়াশুনো মাথায় উঠবে। এখানকার ভাল স্কুল থেকে ওদের ছাড়িয়ে নিয়ে জেলা-শহরের সাধারণ স্কুলে ভর্তি করতে হবে। তাছাড়া রমার স্কুল। এ বাজারে অমন মাইনের স্কুল কোথায় পাবে রমা ওখানে?

এই দোটানায় পড়ে কী এক অস্বস্তি—এই অস্বস্তি নিয়েই কি স্ক্রিপ্ট করা যায়, না? বাবার বয়স হয়ে গেছে। কলকাতায় এলে নিজেকে

মানাতে পারবেন না। আমিও মধ্য বয়সে। আলাদা থেকে থেকে এখন কি আর মাথার ওপর বাবাকে নিয়ে সংসার করতে পারবো ?

নাঃ! এরকম থিম নিয়ে অনেক গল্প—উপন্যাস-সিনেমা-সিরিয়াল হয়ে গেছে। এ একদম বাসি সাবজেক্ট। তবে হ্যাঁ—ওর ভেতর গৃহ-দেবতা—আটশো বছরের শ্রীধরকে ঢোকালে ব্যাপারটা আলাদা একটা ডাইমেনশন পায়।

বিছানায় বসে বসেই জানলা দিয়ে কলকাতা দেখা যায়। সৌরভ দেখলো, বেড়ে ওঠা কলকাতা মানে এলোপাতাড়ি গজানো কিছু বাড়ির মাথা। শ্যাওলা-ধরা দেওয়াল। চকচকে গ্রিলের বারান্দা। আবার মন্দিরের মাথা। মসজিদের মিনার। তাদের ভেতর দিয়ে ধোপার মাঠে শুকোতে দেওয়া ছাপা শাড়ি। সিমেন্টের পরী মাথায় নিয়ে দাঁড়ানো সাবেক, পোড়ো জমিদার বাড়ি। তাতে জায়গায় জায়গায় অশ্বত্থ চারা।

ভেঙে-পড়া বড় বাড়ির কাহিনীতে রহস্য থাকে।

সে রহস্য নিয়ে গোয়েন্দা গল্প হয়। খুন। তদন্ত। তদন্তের জন্যে ধাপে ধাপে যুক্তি। অসম্ভব বুদ্ধিমান গোয়েন্দা। খুনীও রীতিমত তুখোড়। সিরিয়ালের শেষদিকে অপরাধীকে ধরে ফেলার জন্যে জাল গুটিয়ে আসবে। সামান্য একটা ক্লু ধরে—যেমন কিনা বাসের টিকিট নয়ত একখানা পুরনো পোস্টকার্ড অকাট্য প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে। শেষে খুনী যদি ইনটেলেকচুয়াল হয় তো সামান্য ডিঙি বেয়ে পুরীর সমুদ্রে এগিয়ে গিয়ে ভাসতে-ভাসতে হারিয়ে যাবে। আর যদি স্মাগলার টাইপের হয় তো আন্দামানের জনবসতিহীন এক দ্বীপ থেকে হেলিকপ্টারে উড়ে পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে লিটল আন্দামানের মাটিতে আছড়ে পড়বে। ডেড্‌বডি টেনে বের করতে করতে জানা যাবে—স্মাগলার হলেও অতীতে এই ক্রিমিনাল মেডিক্যাল কলেজে টক্সিসিটির প্রফেসর ছিলেন। বিপথে গিয়ে এমনটি হয়ে যান।

আবার ভেঙে-পড়া বড় বাড়ির কাহিনীতে প্রেমও থাকে। লোভ, ঈর্ষা, ধনসম্পত্তি আর মিথ্যে মর্যাদার বড়াই মানুষকে কোথায় টেনে

নামায়—তাই নিয়েও পরতে পরতে গল্প ফাঁদা যায়। গরীবের সুন্দরী মেয়ে অবস্থাপন্ন বাড়িতে বউ হয়ে এসেছিল। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে। যার সঙ্গে বিয়ে হল—সে একজন মোদো মাতাল। আরও সব গুণ আছে। বউকে সে অবহেলাই করতো। বউ প্রতিশোধ নিল বাড়ির এক আশ্রিত সুপুরুষকে ভালবেসে। বড় বাড়িতে তাই নিয়ে টানাপোড়েন, খুন।

কোন্ দিকে যাবে সৌরভ তা বুঝতে পারছিলো না। যে দিকেই সে যাক—তারই স্ক্রিপ্টে সে নেবে সুপুরুষ গোয়েন্দা কিংবা সুপুরুষ আশ্রিত যুবকের রোল। তাই তো ইচ্ছে সৌরভের।

ব্রজ বাগচির বেশি বয়সের সবেধন সন্তান সৌরভেরও বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। সে স্কুলে থাকতেই মফঃস্বল শহরের স্টেজে রিসাইটেশন, ছোটো ছোটো রোলে অভিনয় দিয়ে শুরু করে। লোকাল কলেজে সে ড্রামা সেক্রেটারি হয়েছিল। তখন থেকেই নিজের গলার স্বর, হাঁটার ভঙ্গি, মাথার চুলের কাটিং, পাঞ্জাবির ঝুল, ট্রাউজারের ঘের নিয়ে সৌরভ মাথা ঘামায়। টিভি স্টেশনেও সৌরভ কথার জবাব দেবার সময় কিংবা কোনো কথা শোনার সময় মেপে ঘাড় ঘোরায়, ঘুরে দাঁড়ায়, পোজ নিয়ে কথা বলে—ভ্রূভঙ্গি করে। তার হাসির তো কথাই নেই। স্মিত হাসি, উদ্দাম হাসি, কথার ফাঁকে সামান্য হেসে নেওয়া—এসব মাঝে মাঝেই প্র্যাকটিস করে থাকে সৌরভ। বিশেষ করে যেদিন সে খাবার টেবিলে আয়না আর মগ নিয়ে দাড়ি কামাতে বসে। সৌরভের এই হাসির দর্শক আর শ্রোতা দুইই হল তার বউ ছেলেমেয়েরা।

একদিন অমন উদ্দাম হাসির মহড়া দিতে দিতে সৌরভ দাড়ি কামানোর পকেট আয়নার মুখোমুখি দেখতে পেয়েছিল—তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। চোখ মুছে সে তার বউ রমাকে বলেছিল, জানো—গোড়ার দিককার ছবিগুলোয় উত্তমকুমারের হাসি ছিল খুবই খারাপ—মোস্ট আনইমপ্রেসিভ। তিনি বাড়িতে, আয়নার সামনে হেসে হেসে ইমপ্রুভ করেন।

উত্তমের হাসিই তো লাখ টাকার—

রমার একথায় সৌরভ বিশেষজ্ঞের গলায় পজ দিয়ে দিয়ে বলেছিলো, সে তো হাসি প্র্যাকটিস করে করে ও জায়গায় পৌঁছেছিলেন উত্তম।

তোমাকেও তাই করতে হবে। বড় আয়না দরকার। দেখি এমাসে—

কেন? তোমার ড্রেসিং টেবিলেই তো।

ওখানে তোমায় কুঁজো হয়ে হাসতে হয়।

হাসালে রমা। টুল পেতে তাতে বসে হাসবো। আসলে কি জানো রমা—বয়সটা তো বেড়ে যাচ্ছে।

বাড়ুক না।

বলছিলাম—বয়সের সঙ্গে ফ্যাট জমছে—মুখে, কোমরে, ঘাড়ে—

ব্যায়াম করো। হলিউডের স্টাররা তো ষাট বছর বয়সেও হিরো হন।

সেরকম গল্প নিয়ে আমাদের দেশে সিনেমা হয় কোথায়! তার ওপর আরও একটা প্রবলেম আছে।

কী?—বলে রমা উঠে দাঁড়াল।

ক্যামেরার চোখকে তো ফাঁকি দেওয়া যায় না। চোখের নিচের রিংফলসগুলো ধরা পড়ছে।

অনুভা বলে উঠলো, হ্যাঁ বাবা। তুমি যখন ক্যামেরার দিকে চোখ তুলে খবর পড়—তখন বাঁ চোখের নিচে—

তুই থাম্। ওসবের ওষুধ আছে।—বলে রমা তার স্বামী সৌরভের হিরো হবার স্বপ্ন আরও উস্কে দিয়েছিলো। বলেছিলো, এক কাজ করো। কাল থেকে আর ভাত বা রুটি—কোনোটাই খেয়ো না। স্রেফ স্যালাড্, ডাল সেদ্ধ, বাড়িতে পেতে টক দই দেবো দুবেলা—আর ছোট মাছের ঝোল।

তাতে না-হয় আর মোটা হবো না রমা—

ফ্যাট কমাতে হলে সেই সঙ্গে তোমায় জগিং করতে হবে। ফ্রি-হ্যান্ড এক্সারসাইজও চালিয়ে যেতে হবে। ফরেনে আর্টিস্টরা তো ঘাম ঝরিয়ে

দৌড়োয়—সাঁতরায়—তাই অমন ছিমছাম চেহারা হয়। চোখের নিচের ফোলা-ফোলা ভাব শশার রস—

থামিয়ে দিয়েছিলো সৌরভ। বলেছিলো, এত করেও যদি চান্স না পাই। ডিরেক্টরের মনে ধরা চাই আমাকে।

তুমি তো আর আননোন্ নও। প্রায়ই টিভি-তে খবর পড়ছো। এই করেই তো স্মিতা বেনেগালের চোখে পড়েছিল। তারপর তোমার নিজের ডিরেকশনে সিরিয়াল চলবে। তখন দেখো—আমি বলে দিলাম—

হাত তুলে সৌরভ রমাকে থামিয়েছিল। বলেছিল, এখন বোলো না কিছু। যখন হবে তখন—বলে সে নিজেও থেমে গিয়েছিল।

এই তো গতকালই সে শেষরাতে স্বপ্নে দেখেছে- পূর্ণতে ইভনিংয়ে তার ছবির প্রিমিয়ার শোয়ের পর দোতলার সিঁড়ি দিয়ে যখন সে নামছে —তখন নিচের দর্শকরা হল থেকে বেরোতে বেরোতে তাকে দেখে বলে উঠলো. ওই যে! ওই যে! সঙ্গে সঙ্গে সৌরভ পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বের করে নিজের মুখে চাপা দেয়। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে। পাছে. তাকে দেখার জন্যে স্ট্যামপিড্ হয়ে যায়—এই ভয়ে। এমনিতেই তো ম্যাটিনি শোয়ে টিকিটের জন্যে হুজ্জোতি হওয়ায় পুলিসকে লাঠি চালাতে হয়েছে।

স্বপ্ন ফস করে শেষ হয়ে যাওয়ায় সৌরভের ঘুম ভেঙে যায়। শীতের লেপের আরামের ভেতর তার মনে পড়লো উঠতি হিরো হিসেবে উত্তম পূর্ণ হলে তাঁর হ্রদ ছবির প্রিমিয়ার শো দেখতে এসে এমন করেছিলেন। তখন স্কুলে পড়ে সৌরভ। বাবার সঙ্গে কলকাতায় এসে মামাবাড়ি উঠেছিল। মামীদের সঙ্গে হ্রদ দেখতে গিয়ে সে এইভাবে সাক্‌সেসফুল হিরো উত্তমকে প্রথম দেখে।

শীতের দুপুরে বিছানায় বসে এভাবে সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে সৌরভের মনে হল—রমার মুখে এই—তখন দেখো—কথা দুটি যেন দুনিয়ার সেরা স্বপ্নের বোমা দিয়ে ঠাসা। যে-কোনো সময় বিস্ফোরণ

ঘটতে পারে। তা ঘটলেই দেখা যাবে মফঃস্বল শহরের প্রায় মাঝবয়সী সৌরভ বাগচি রাতারাতি স্টার হয়ে পড়েছে। শহর জুড়ে প্র্যাকটিস করা তারই হাসিমুখের বড় বড় কাট-আউট—এসপ্ল্যানেড, গড়িয়াহাটা, শ্যামবাজার, বেহালার মোড়ে। বাজারে তাকে নিয়েই যত গুজব। রমাকে ডিভোর্স করে সে নতুন এক স্টারকে বিয়ে করছে। সিনেমার কাগজে তার ছবি দিয়েছে -সিক্স সিলিণ্ডার ঢাউস গাড়ির সামনে সৌরভ বাগচি দাঁড়িয়ে। গোয়ার সি-বিচে শুয়ে শুয়ে সৌরভ ঢাউস ছাতার নিচে স্ক্রিপ্ট শুনছে—উপুড় হয়ে—সেই ছবি দিয়ে সিনেমা সাপ্তাহিকে কাভার।

আসলে রমার এই 'তখন' কথাটায় দারুণ এক বিদ্যুৎ ভরা আছে। সৌরভ বেশ লম্বাই। তার ওপর লাবণ্যর টিকালো নাক—ভাসা ভাসা চোখ পেয়েছে। মাথা ভর্তি ব্রজ বাগচির মতই চুল। ঠাসা। হাত-পায়ের গড়ন লম্বা লম্বা। এমন একটা শরীর নিয়ে সৌরভ টিভি-তে সারাদিনে মাত্র পনের মিনিট খবর পড়ে সুখী নয়—সে নিজেই খবরের মত খবর হতে চায়।

মনের ভেতর কয়েক পলকে হাজার বছর ঘুরে ফিরে আসা যায়। সৌরভ এই ভেবে খুব খুশি হল, আজও কোনো মহাকাশযান মনের এই স্পিডের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি। রমার প্রেসার কুকার সম্ভবত তিননম্বর হুইস্‌ল দিল। সৌরভ খাটের পাশের টেবিল থেকে একটা চটি বই তুলে নিল। কতই তো বই রয়েছে। পাতা ওল্টাতেই কবিতা। সৌরভ কলেজ লাইফের পরেও অনেকদিন পদ্য লিখেছে। খাঁটি কবিতায় গরমের দিনে ফোঁটা ফোঁটা ঘামের মতই একটা দর্শন আপনা আপনি ফুটে উঠবে। তাতে অতি সামান্য কাহিনীর ছিঁটেফোটা মিশেল থাকবে। প্রায় বুঝতে পারছি—বুঝতে পেরে কী ভীষণ সত্য অথচ রহস্যময় ভেবে—কবির প্রচণ্ড ক্ষমতায় মাথা নুয়ে আসবে। ভাল কবিতা নিয়ে সৌরভের ভাবনাটা অনেকটা এরকম। মানে খুব ভাল কবিতা। যা পড়লে মনে হবে রবীন্দ্রনাথ অত বছর ধরে ওসব কি করেছেন? এখন

সে দেখছে —অনেক কবিতাই স্রেফ একটা কাহিনী বা গল্প। তাতে মাঝে মাঝে ভারি ভাবনার দু'এক লাইন ঝিলিক।

আজকাল সৌরভের মনে হয়—আমি কবিতা লিখতে গিয়েছিলাম—বিশেষ হবো বলে। কবিতা থেকে তুলে নিয়ে লোকে আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বিস্মিত হবে। কিন্তু তা হল না। আমি সামান্যই রয়ে গেলাম। এই সামান্য হয়ে থাকার যন্ত্রণা যে কী ভয়ংকর। এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যেই বোধহয় আজকাল এত থিয়েটার। বিশেষ হয়ে ওঠার জন্যে।

কয়েকটি লাইনে তার চোখ আটকে গেল—

এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে—জানি না সে এইখানে
শুয়ে আছে কিনা।
অনেক হয়েছে শোয়া—তারপর একদিন চ'লে গেছে
কোন্ দূর মেঘে।
অন্ধকার শেষ হ'লে যেই স্তর জেগে ওঠে আলোর আবেগে।
সরোজিনী চ'লে গেল অতদূর? সিঁড়ি ছাড়া—পাখিদের
মতো পাখা বিনা?
লুপ্ত বেড়ালের মতো; শূন্য চাতুরির মূঢ় হাসি নিয়ে জেগে।

টেবিল সাজাতে সাজাতে রমা ডাক দিল, সবাই খাবে এসো।

খিদে আর লোভের ভেতর সুগন্ধ মিশে যাচ্ছিলো। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ মাংস খায়। সেই স্বাদের সুখস্মৃতি সৌরভের মনটা তার অজান্তেই ফুরফুরে করে তুললো। সে তখনই রমার ডাকে খাবার টেবিলে গিয়ে বসলো না। কেননা, অনেকদিন পরে সৌরভের ভেতরে কবিতা ফুটে-ফুটে উঠছিল। তার চোখ কয়েকটি লাইনে গিয়ে আটকে যাচ্ছিল। যেমন—

জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা
প্রস্তর যুগের সব ঘোড়া যেন—এখনও ঘাসের লোভে চরে

যদিও সে সব কবি ক্ষুধা প্রেম অতলের সেঁক চেয়েছিলো
বাণিজ্যবায়ুর গল্পে একদিন শতাব্দীর শেষে অভুত্থান শুরু হ'লো
শাদা চাদরের মতো—জনহীন—বাতাসের ধ্বনি

রমা চেঁচিয়ে ডাকলো, ভাত জুড়িয়ে যাবে কিন্তু। সৌরভের মনে পড়লো, পৃথিবীর পুরুষমাত্রই যা কিছু খায়—তা গরম গরম খেতেই ভালবাসে।

ছয়

ডাকঘরে সই মিলিয়ে শ্রীধরের জন্যে সুদ তোলা এক ঝকমারি। জেলা শহরের বড় ডাকঘরের কাউণ্টারে ব্রজ বাগচির পাশে দাঁড়ানো স্বপন বললো দাদু—এবার হাত শান্ত করে সই করেন।

তুই থাম তো—বলে ধমকে উঠে ব্রজ বাগচি ফের তাঁর রাজা ফাউণ্টেন পেন বাগিয়ে ধরলেন। সেই কবে কলেজ ছেড়েছেন—তখনকার কলম—ইংরেজি ছোট হাতের একটি 'আর' হরফ লাগে ব্রজ লিখতে। কিন্তু লিখতে গিয়ে হরফটি বারবার 'এন' হয়ে যাচ্ছে। কাউণ্টারে লোকও বদলায়। সে তো বেঁকে বসেছে। বলছে—সই মিলছে না যে।

শ্রীধরের জন্যে ব্রজর সুদ তুলতে আসা এক আয়োজন। হাতে পাশবই, বুকে কলম, পাশে স্বপন, গলায় কম্ফার্টার—বলা যায় না কখন আবার গলায় ঠাণ্ডা বসে যায়—স্বপনের ডান হাতের ঝোলায় দুই রকমের চশমা—বাঁ হাতে ছাতা। সাদা মোজা পরে লাল কেডস্ পায়ে দিয়ে এই অবস্থায় ব্রজ বাগচি রিক্সায় ওঠেন। চল বড় ডাকঘর। স্বামীকে রওনা করিয়ে দিয়ে লাবণ্য বলেন দুগ্গা—দুগ্গা—

ফের নিজের নাম লিখে ক্লান্ত, নিরুপায় ব্রজ বাগচি কাউণ্টারের ছোকরা মত ছেলেটিকে বললেন, হাত কেঁপে যাচ্ছে। কি করবো? আপনার আগের লোক আমায় চিনতেন।

না মিললে আমি কি করবো? আপনাকে চেনেন এমন কাউকে ডেকে আনুন।

ব্রজ বললেন, তাকে যদি আপনারা না চেনেন।

ঠিক এইসময় পেনসনার্স অ্যাসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট—সারাদিন ডাকঘরে আড্ডা দেওয়া এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, আরে! এ তো আমাদের ব্রজবাবু। আমি আইডেণ্টিফাই করছি।

ব্রজ তাঁকে আদৌ চেনেন না। এখনো এমন উপকারী লোক তাহলে আছেন? এই কথা ভেবে তাঁর মুখে একরকমের হাসি এল। যাতে বোঝায়—আপনাকে ধন্যবাদ। তিনি জানেন, এমনিতে যুদ্ধের আগে—যাকে এখন ইতিহাসে বলে সেকেণ্ড গ্রেট ওয়ার—পাড়াপড়শী তো বটেই—অচেনা, অজানা মানুষকেও লোকে পারলে উপকার করতো। গেরস্থবাড়ির কর্তা অন্নপ্রাশন, বিয়ে, পৈতেয় নেমন্তন্ন পেলে তিন-চারটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে নেমন্তন্ন রাখতে যেতেন।

শীতের দুপুরে সুদের কড়কড়ে নোট ক'খানি বুক পকেটে নিয়ে ব্রজ বাগচি রিক্সাসায় উঠেই বললেন, চলো নাকাশিপাড়া। সৎচাষী-পাড়া, নেদেরপাড়া, পোড়ামাতলা হয়ে বাড়ি ফিরবো।

স্বপনের তো মজা। হাঁটতে হচ্ছে না একদম। অথচ সিনেমার মত দু'পাশ দিয়ে লোকজন, দোকানপাট, বাড়িঘর বয়ে যাচ্ছে। ফি-মাসে সুদ তোলার পর ব্রজ বাগচি রিক্সায় বসে সারা শহরটা একবার চক্কর মারেন।

ফি-মাসেই ব্রজ বাগচি দেখছেন—শহরটা পালটে যাচ্ছে। নেদের-পাড়ার মোড়ে পি ডব্লু ডি'র রাস্তা দফতর একটা মাইলফলক বসিয়েছিল। কলেজে নতুন ভর্তি হয়ে ওটার ওপর ডান পা রেখে ব্রজ কতদিন সিগারেট ফুঁকেছেন। যেদিন তিনি বিয়ে করে বউ নিয়ে ফিরছেন—সেদিন কী বৃষ্টি। জলে সারা শহর ডুবুডুবু। খড়ের বুক ফুলে-ফেঁপে একাকার। গলাখাঁকারি দেওয়া হর্নওয়ালা একটি টি-ফোর্ডের পেছনের সিটে তিনে লাবণ্যকে নিয়ে বসেছিলেন। আকাশ

অন্ধকার। বেনারসীর ভেতর লাবণ্য হারিয়ে গেছে। তখন তো ও খুকীটি মাত্র।

আজ সেই মাইলফলকাটাকে তিনি নেদেরপাড়ার মোড়ে খুঁজে পেলেন না। চেনা জায়গায় তাকিয়ে দেখলেন, সেখানে ইলেকট্রিকের একটা সিমেণ্ট পোল। স্কুলের বন্ধু কলেজের ক্লাশফ্রেণ্ড, ল-এর ব্যাচমেট, ওকালতির দিনগুলোর কলিগদের ভেতর সামান্য ক'জনের নাম মনে আছে। অক্ষয় থাকতো সৎচাষীপাড়ায়। একতলা সাদা বাড়ি। আলকাতরা রঙের জানলা দরজা।

ব্রজ রিক্সাওয়ালাকে বললেন, এই ফলসা গাছটার ডানদিক দিয়ে চল। গাছটা খুব চেনা। তারপরই সব অচেনা লাগলো। কোথায় সাদা একতলা! সব বাড়িই দোতলা, তেতলা, চারতলা।

একটা দোতলা বাড়ির বারান্দা রেনওয়াটার পাইপ দেখে অক্ষয়দের সাবেক বাড়িটাকে সনাক্ত করলেন ব্রজ। রিক্সা থেকে নেমে ডাকতে লাগলেন, ও অক্ষয়—অক্ষয়। অক্ষয় আছো নাকি?

দুপুরবেলা। পাড়াটা খাঁখাঁ করছে। ব্রজ বাগচি ভাবছেন—যাই, চলে যাই। স্বপন রিক্সা থেকে নামেইনি।

খুট করে দরজা খুলে গেল। ব্রজ দেখলেন, মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক। ডানহাতে প্ল্যাস্টার। মুখে একটুও হাসি নেই।

অক্ষয় আছে? অক্ষয় হালদার?

ভদ্রলোক ভাল করে দেখলেন ব্রজকে। তারপর বললেন, আমি তার ছেলে। আপনি?

অক্ষয় আর আমি একই দিনে জেলা বার কাউন্সিলের মেম্বার হই। আমি ব্রজ বাগচি। বিশ ত্রিশ বছর তো এদিকে সেভাবে আসিনি।

ওঃ! আপনার নাম বাবার মুখে অনেকবার শুনেছি। তিনি প্রায়ই বলতেন। বসুন—বলে ভদ্রলোক একটু পিছোতেই ব্রজ চমকে উঠলেন। বলতেন? মানে—

নাঃ! আমি চলি। কবে গেল অক্ষয়?

এই পৌষে সাত বছর হবে।

ব্রজ ফের রিক্সায় বসলেন। শহরটা যেমন বদলে গেছে—চেনা মানাষজনও কেউ বলতে নেই। একটা জায়গা—একটা পাড়া—একটা শহর তখনই নিজের মনে হয়—যদি লেপের দোকানে তুলোর ধুনুরি দেখেই চিনতে পেরে বলে—আপনার তোশকে বাবু সাত কিলো তুলো দিতে হবে—যদি ওষুধের দোকানি বলে—আপনার তো সালফার অ্যালার্জি আছে—ও ওষুধ চলবে না—কিংবা বাসস্টপের বটতলাকে দূর থেকে দেখেই যদি মনে হয়—ওখানে গেলেই আমার সব চেনা লোক বেরিয়ে পড়বে। এই শহরের মায়ায় আমি এখানে পড়ে আছি? এখানে তো কেউ আমায় চেনে না। আমিও তো কাউকে চিনি না। এখনকার লোকগুলোর কথা বলার ছিরিই আলাদা।

হঠাৎ ব্রজ বাগচি বললেন, খড়ের ওপর পোলের দিকে চল। স্বপন বলল, ফিরে গিয়ে একটু ঘুমোবেন না দাদু?

তুই থাম।

রিক্সাওয়ালা প্যাডেলে চাপ দিতে দিতে বলল, ওঃ! তাহলে মোহিতনগর যাবেন।

ব্রজ বাগচি কোনো জবাব দিলেন না। রিক্সা যতই এগোয় ততোই রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায়—আর নানারকমের গাছ বেড়ে যায়। একসময় শহরের প্রায় বাইরে—অথচ শহরের একদম গায়েই একদম অন্য ধরনের লোকবসতি ভেসে ওঠে। লাল খোয়ার রাস্তা। পিচ খসে গেছে। জাম, বকুল, আমফল—নানারকমের গাছ। এসব বাবা বসিয়ে যান। এখন খেলার মাঠ, আলাদা ডাকঘর, হেলথ্ সেণ্টার, ইলেকট্রিকের সাবস্টেশন, হাইস্কুল কত কি। বাবা এসব জায়গায় ধান লাগান। লাগিয়ে ডুবতে বসেন। ফের আবার ভেসে ওঠেন।

কোনো কোনো বাড়ি চাটাইয়ের দেওয়াল, সিমেণ্ট মেঝে, ওপরে করোগেট—নয়তো টিন। অনেক জায়গার ওপর যেন বা বাংলো বাড়ি। উঠোনে জামরুল গাছ—গাছতলায় মুরগি, গরু ছাগল। আবার টিনের

চালে টিভি অ্যাণ্টেনা। পাকা বাড়িও অনেক। তাদের দেওয়ালে স্লোগান। বারো নম্বর ওয়ার্ডে—অমুককে জয়যুক্ত করুন। ক'বছর হল মোহিতনগর পুরসভার আওতায় এসেছে। বাবা কি কোনদিন ভাবতেও পেরেছিলেন—তাঁর সমবায় চাষের আস্ত দ'দুটো মৌজার মাঠে দিব্যি একদিন নগর বসে যাবে। সেই সব মাঠে একদিন ঘরবাড়ি বানিয়ে মানুষজন ছেলেমেয়ে—নাতিনাতনী রেখে যাবে। তাদের স্মৃতি জমা হবে ওই সব মাঠে—গাছতলায়—ঘরবাড়িতে। তারা মনে করবে—ওটাই তাদের পৃথিবী।

প্রায় বিকেলে বাড়ি ফিরে ব্রজ বাগচির খুব আনন্দ হল। কলকাতা থেকে সৌরভ এসে মোহিত বাগচির কেঠো চেয়ারটায় বসে। তার ছেলে-মেয়ে অনুভা আর বিকাশ তাদের দাদুর গলা পেয়ে বিরাজির কুঁড়ে-ঘর—ফুলবাগানের দিক থেকে ছুটে এল।

সৌরভ এখন আলাদা লোক হয়ে গেছে। ব্রজ বেশ সমীহ করে বললেন, কখন এলে ?

বেলা ন'টা পঞ্চাশের গাড়িতে—

কোনো কষ্ট হয়নি তো ?

নাঃ ! মোটে তো সাড়ে তিন ঘণ্টার জার্নি। বাড়িটা কি হয়ে আছে বাবা ! একদম ঘোস্ট হাউস।

কি করা যাবে। আমরা তো দুটো ভূত বাস করি এখানে—

সৌরভ সিধে হয়ে বসলো। সে বলতে যাচ্ছিলো—তা বলিনি বাবা আপনি ভুল বুঝছেন। কিন্তু সেকথা বলার সুযোগ হল না তার। ব্রজ বাগচি নাতি-নাতনীর হাত ধরে দোতলায় উঠে গেলেন। উঠতে উঠতে বললেন, বউমা ? তুমি এখন কোথায় ? কোনদিকে ?

বাড়িটা এতই বড়—তার দু'তিনটে দিক আছে। রাস্তার দিক। বাগানের দিক। সৌরভ নিচে বসেই শুনতে পেল, রমা জবাব দিচ্ছে—যাই বাবা—

অনেকদিন পরে সারা বিকেলটাই বড় সুন্দর লাগলো ব্রজর। স্বপন ছুটে ছুটে এটা ওটা এগিয়ে দিচ্ছে। কলকাতা থেকে ভাল পাতা চা এনেছে রমা। সেই চায়ের সঙ্গে ক্রিম ক্রেকার। অনেকদিন পরে নিজের ছেলের বউয়ের হাতের চা খেলেন লাবণ্য। খেয়ে বললেন, আর আছে নাকি?

অনেকটা করেছি। নিন মা—

কম না পড়লে দাও—বলে খালি কাপ এগিয়ে দিলেন লাবণ্য। সারা বিকেলটা যেন চায়ের সঙ্গে মুখের ভেতর থেকে গেল। ব্রজর মনে হচ্ছিল—তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেকার মতই সারা বাড়ি যেন জমজমাট হয়ে উঠেছে।

স্বপনকে বড়বাজারে পাঠাবার সময় লাবণ্য বারবার বলে দিলেন, রিক্সা করে যাবি। রিক্সায় ফিরবি। বাজার নামিয়ে দিয়ে পাশের ঘরে লেপতোশক নামাবি আলমারি থেকে। মশারি টানাতে হবে।

সন্ধ্যের মুখে সৌরভ হোল ফ্যামিলি নিয়ে শহর দেখাতে বেরুলো। তখন ব্রজ বাগচি টিভি-র সামনে বসলেন। আজ অন্যদিনের চেয়ে বসতে তাঁর বেশি ভাল লাগলো। লাবণ্য পরুতঠাকুরের মেয়েকে ডাকিয়ে এনে রান্না চড়িয়েছে। বড়বাজারে মাছ না পেয়ে স্বপন বুদ্ধি করে খড়ের গায়ে জেলেপাড়া থেকে টাটকা চাপলি মাছ এনেছে। হলুদ-কাঁচালঙ্কা মাখানো মাছের তাজা গন্ধ অনেকদিন পরে এ-বাড়ির বাতাসে। নয়তো এখানে রাতে বেশির ভাগ দিনই কিছুই রান্না হয় না। ব্রজ আর লাবণ্য সাধারণত দুধ আর এটা ওটা খেয়ে থাকেন। ব্রজর মনে হচ্ছে—এ বাড়ি বুঝি তিরিশ-চল্লিশ বছর আগের মত ফের জেগে উঠেছে। ঠিক এই সময় টিভি চলল—

আসানসোল, বহরমপুর কার্শিয়াং ছাড়াও নতুন আরও তিনটি রিলে স্টেশন আজ থেকে চালু হল। সেইসব স্টেশন হল—

ঝাউদিয়া, রহমতপুর, মোহিতনগর।

পুরনো আমলের চেয়ারে সিধে হয়ে বসলেন ব্রজ। কি ব্যাপার? কোন্ ঝাউদিয়া?

ব্রজর সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গিতে টিভি-র পর্দার মেয়েটির মুখ বড় হয়ে উঠলো। সে ব্রজর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললো, দৌলতপুরের ঝাউদিয়া—

হ্যাঁ। আমাদের ঝাউদিয়ার থানা তো দৌলতপুর। জেলা কুষ্টিয়া।

ততক্ষণে টিভি-র পর্দার মেয়েটি একদম উবে গেছে।

ব্রজ বাগচি উঠে দাঁড়িয়ে টিভি-র টিউনারটা ঘুরিয়ে দিলেন। অমনি পর্দা জুড়ে কাশীর গঙ্গার ঘাট। মাঝখানে চরে সাদা শামিয়ানার নিচে একদল লোকের ভিড়। পাশেই বজরা ভেড়ানো। চরের চারদিকে থই থই গঙ্গার কূল। ওপাশের জলের ওপারে সাদা বালির ধুধু নদীখাত।

শামিয়ানার নিচের ভিড়টা ক্লোজ শটে টিভি-র পর্দায় বড় হয়ে উঠলো। এবার বোঝা গেল—রাতের গঙ্গা। দূরে সাদা বালিয়াড়ির ওপর ঝুলে পড়া নীল দিগন্তে হলুদ রঙের একখানি ভাঙা চাঁদ। শামিয়ানার নিচের আসরেও আলো—কাচের বড় ঘেরের ভেতর মোটামত মোমবাতির সিধে শিখা। সেই আলো ঘিরে ঘুঙুর-পায়ে, হাতে, চোখে চিবুক দুলিয়ে একজন মেয়েলোক দিব্যি নাচের নানান ভাও দেখাচ্ছে। তার দু'ধারে দুই মাঝবয়সী পুরুষ। দু'জনই লম্বা চওড়া। দু'জনেরই পোশাক সাদা চুড়িদার। দু'জনেরই গোঁফ। আশপাশের সবাই হল্লা করলেও ওরা দু'জনে আপনমনে যে যার কোলের ওপর বেহালায় ছড় টেনে চলেছে। একদম অচঞ্চল।

ঘুঙুরের বোল এবার জলদে। হঠাৎ দেখা গেল একজন মাঝবয়সীর হাতে ছড় দ্রুত লয়ে টানাটানির সময় পিছলে হাতের বাইরে চলে গেল। অমনি সবাই হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, হার গয়া! হার গয়া!!

মেয়েলোকটি তখনো নাচছে। অন্য মাঝবয়সীর হাতের ছড় দিব্যি সেই নাচের জলদের সঙ্গে উঠছে—পড়ছে।

একসময় নাচ থামলো। যার হাতের ছড় পড়েনি—সেই মাঝবয়সী মানুষটি উঠে দাঁড়িয়ে একহাতে বেহালা অন্যহাতে নাচিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে বজরায় গিয়ে উঠলো। উঠবার সময় সে একবার ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হেরো মাঝবয়সীকে হাসতে হাসতে বললো, ফির দেখা যায়েগা!

সঙ্গে সঙ্গে ব্রজ বাগচি চেঁচিয়ে উঠলো। ও তো গৌরী বাগচি। গৌরী বাগচি···

লাবণ্য পুরুতমশায়ের মেয়েকে রান্না দেখিয়ে এসে এ-ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, এই বয়সে অ্যাতো চেঁচাচ্ছেন কেন? কি হল?

দেখবে এসো লাবণ্য। এইমাত্র গৌরী বাগচিকে দেখালো।

লাবণ্য চোখ কুঁচকে তাঁর এতদিনকার স্বামীর মুখে তাকালেন। তারপর থেমে পড়ে বললেন, তা কি করে হয়? আপনার ঠাকুর্দা গৌরী বাগচি?

হ্যাঁ। সেই যে তিনি কাশীতে বেহালা বাজিয়ে বাঈজী জিতে ঝাউদিয়ার বাড়িতে নিয়ে আসেন।

হ্যাঁ। মায়ের মুখে আমিও শুনেছি সে গল্প। তিনি তো আপনার জন্মের আগেই মাঁরা যান।

আমি যে তাঁর অয়েলপেইন্টিং দেখেছি।

দেখেছেন ঠিকই। কিন্তু তিনি কি করে টিভি-তে আসেন?—বলে লাবণ্য চুপ করে গেলেন। শেষে বললেন, এসব কথা আবার সৌরভের সামনে পাড়বেন না যেন। কতদিন বাদে মোটে আজই এসেছে—

তা আসুক না। আমাদেরই তো ছেলে। তাছাড়া ও টিভির লোক। ওকেই তো বলতে হবে।

কেন?

টিভি-তে এইমাত্র বললো, আজ থেকে ঝাউদিয়া, রহমতপুর, মোহিতনগরে নতুন রিলে স্টেশন—

থামুন। এসব কথা বললে ও কিন্তু কালই চলে যাবে।—বলেই লাবণ্য মনে মনে বললেন, মাথাটা গেছে।

সামনের রিক্সায় রমা আর বিকাশ। পেছনেরটায় সৌরভের সঙ্গে অনুভা। এক একটা মোড় পেরিয়ে যায় আর সৌরভের ইচ্ছা হয়—ইস্! এখানে নামলে অমুকের সঙ্গে দেখা হত। ওখানে নামলে অমুকের সঙ্গে দেখাহোত, কতদিন দেখা হয় না। আবার এও মনে হল—নেমেই সেই মফঃস্বলী হতাশা আর বোকামির মুখোমুখি হতে হবে। তুই তো সৌরভ কলকাতায় থাকিস। টি ভি-তে তোকে সবাই দেখে। চেনে। সৌরভের তখনই সবচেয়ে অস্বস্তি হয়—যখন, তার দিকেও লোকে এমন চোখে তাকায় যন সেও একজন সেলিব্রিটি।

কমলা আর নতুন গুড়ের সন্দেশ কিনে দিয়ে সৌরভ রমা আর অনুভা-বিকাশকে বাড়ি রওনা করিয়ে দিল। রমা যাবার সময় বলল, দেরি কোরো না কিন্তু। বাবা মা তোমার সঙ্গে গল্প করবেন বলে বসে থাকবেন কিন্তু।

তুমি দিয়ে গল্প কর।

না। তোমার সঙ্গে কথা বলে ওঁরা সবচেয়ে আরাম পান।

অনু আর বিকাশ তো আছে।

ওরা বেশিক্ষণ পারবে না।

সৌরভ ঘুরতে ঘুরতে শহরের বন্ধ হয়ে যাওয়া নাট্যনিকেতনে এসে হাজির হল। সাতপুরনো এক হল। তার অনেকটা জুড়েই এখন শাড়ির দোকান। একটা ছোট্ট লাইব্রেরি আর তার লাইব্রেরিয়ানকে পেল সৌরভ। স্টেজের জায়গাটায় কিছু পুরনো সিন-সিনারি পড়ে আছে। রাজপ্রাসাদ। নদীতীর। গহন অরণ্য। অডিটোরিয়াম

ফলাতে গাদাগুচ্ছের টিনের চেয়ার। মাথার ওপর ঝুলন্ত পাখাগুলোর ব্লেডে পায়রার পাখার চুনকাম। একদিককার দেওয়ালে গিরিশ ঘোষ আর শিশির ভাদুড়ির ছবি। অন্য দেওয়ালে চারখানি ছবি। চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র।

লাইব্রেরিয়ানের বয়স না-হোক সত্তর। তাঁকে সৌরভ বলল, কতদিন থিয়েটার হয় না?

আমি এসে ইস্তক দেখিনি। তবে স্কুলে যখন পড়তাম—তখন এখানে গৈরিক পতাকা, সিরাজদ্দৌলা দেখেছি। আর শুনেছি—পি ডব্লু ডি হয়েছিল যুদ্ধের ভেতর।

আপনি মাইনে পান?

হ্যাঁ। বলে হেসে ফেললেন ভদ্রলোক। ঢুকেছিলাম নাট্যনিকেতনের অফিস সেক্রেটারি হয়ে একশো পঁচিশ টাকায়। এখন পাই বারোশোর ওপর।

নাটক নেই—অভিনয় নেই—মাইনে বাড়লো?

এই খুদে লাইব্রেরিটির জন্যে। এখন তো সরকার থেকে লাইব্রেরিতে টাকা দেওয়া হয়। এটা আমার লাইব্রেরিয়ানের মাইনে।

আগেকার কেউ আর আসেন না।

নাঃ! নাটক যাঁরা করতেন—তাঁরা আস্তে আস্তে বুড়ো হয়ে গেলেন।

নতুনরা?

তাঁরা ইণ্টারেস্ট নিলেন না। বেশির ভাগই সিনেমা দেখতে ভালবাসেন। নয়ত কলকাতায় গেলে থিয়েটার দেখে আসেন। আপনি আগেকার নাটকের লোকজনের খাতাপত্র দেখতে পারেন।

আছে?

আসুন না।

সৌরভ লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে গেল। স্টেজের পাশেই বড় একটি ঘর। সেখানে অনেকগুলো ইজিচেয়ার। একটা বড় টেবিল।

তারপরেই থাক থাক ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের গায়ে এক একটি নাটকের নাম লেখা। সৌরভ বুঝলো, এক এক নাটকের ড্রেস এক এক ট্রাঙ্কে।

এই বাঁধাই খাতাখানা দেখুন। একদম গোড়ার দিককার খাতা। প্রায় সবার নাম পাবেন।

খাতা দেখতে গিয়ে সবার আগে ঝাড়ন দিয়ে তার বোর্ড বাঁধাই মলাট আগে ঝাড়তে হল। খাতার পুট মোটা চামড়ার। তাতে সোনার জলে ইংরেজিতে লেখা--নাট্যনিকেতন।

খাতা খুলতেই প্যাট্রনদের লিস্টে তিন নম্বর নাম—শ্রীমোহিত বাগচি। পাশে লেখা—৩০১ টাকা।

সৌরভ দেখলো, চিফ প্যাট্রন দিয়েছিলেন—১০০১ টাকা। মোট বারোজন প্যাট্রন। নিচেই তখনকার তারিখটি লেখা। ১৭-১২-১৯।

ভাববার চেষ্টা করে সৌরভ। ইংরেজি ১৯১৯ সনের ১৭ই ডিসেম্বর দিনটি কেমন ছিল। এক একজন প্যাট্রন তাঁদের নাম লিখে পাশে লিখে দিয়েছিলেন কত দিতে পারবেন। এসব লেখা যখন চলছিল—তখন একটা সভা হয়েছিল নিশ্চয়। সে সভা বসেছিল কখন? সকালে? দুপুরে? না, সন্ধ্যেবেলা?

পাতা ওলটাতে ওলটাতে একজায়গায় এসে ব্রজ বাগচির সই পেল সৌরভ। সন উনিশশো চল্লিশের ৬ই জুলাই। এবার দুর্গাপূজায় কোন্ কোন্ নাটক অভিনীত হইবে তাই লইয়া জরুরী সভা। কয়েকটি নাটকের নামও রয়েছে। তার বাবার সইয়ের নিচে রবার স্ট্যাম্পের ছাপ। সেক্রেটারি, নাট্যনিকেতন ড্রামাটিক ক্লাব।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর ব্রজ বাগচির শোবার বড় ঘরের লাগোয়া বড় ঢাকা বারান্দাতেই সৌরভ আর রমা বসলো। বড় দুই ডেক চেয়ারে। চাদরে পা মুড়ে—গা মুড়ে। বারান্দার সবটাই প্রায় ঢাকা। ভারি পর্দার ফাঁকে বাইরের যা দেখা যায়—তা হল কুয়াশার ওপর চাঁদের ঝকঝকে আলো, সজনে গাছ, শিউলিগাছের মাথা।

লাবণ্য আর ব্রজ বসেছেন দুই ইজিচেয়ারে। তবে ঘরের ভেতর ঢাকা বারান্দায় যাবার খোলা দরজার মুখে। ব্রজ বেশ তৃপ্ত গলায় বললেন, তোমরা যে চেয়ারে বসেছো— ওগুলো সব নতুন।

এত চেয়ার বানিয়ে টাকা নষ্ট করছেন কেন?

সৌরভের একথায় একটুও দমলেন না ব্রজ। বললেন, যেসব ঘর ভেঙে ভেঙে পড়ছে—তাদের জানলা-দরজা, কড়িবর্গা—যেগুলো খুঁতো —ক্ষয় ধরেছে—সেগুলো দিয়ে কি করবো? অতুল এসে বললো—

সেই অতুল আলি!

হ্যাঁ। বসতে কেমন লাগছে?

রমা বলল, ভালই তো।

সৌরভ বললো, একটা ঝাড়লণ্ঠন দেখলাম সিঁড়ির গোড়ায়।

ব্রজ বললেন, তুমি আসার ক'দিন আগে দক্ষিণের একটা ঘর পড়ে গেল। সেখানে ছিল। যা বাঁচানো যায়—বের করে তুলে রেখেছে যোগাড়েরা—

ওটা আপনাদের থিয়েটারের?

সৌরভ আধো অন্ধকারের ভেতর ব্রজ বাগচির মুখে তাকালো। তাকিয়ে চোখ দুটো খুঁজে পেল না। বললো, শখ করে কিনেছিলেন বাবা?

ব্রজ মুখ খুললেন, না সৌরভ। ওই ঝাড়লণ্ঠন আমার ঠাকুদার আমলের।

ওঃ! যিনি বেহালা বাজিয়ে কাশীর বাঈজী জিতে এনেছিলেন তো! ঠাকুমার মুখে শুনেছি।

আরও কত কি করেছিলেন তা জানিনা। আমি জন্মবার আগেই তিনি ওপরে চলে যান।

তা এসব এখানে?

আগে ঝাউদিয়ার বাড়িতেই থাকতো। একটা ঘরে ঠাকুদার গড়গড়া, বেহালা, ঝাড়লণ্ঠন, ফরাস, ঘুঙুর—সবই বন্ধ করে রেখেছিলেন বাবা।

শেষে যুদ্ধের সময় ওসব এখানে এনে তুলে রাখেন। বাবা ওসব ঘেন্না করতেন। তাই তার বাবার জিনিসপত্তর দরজা বন্ধই থাকতো। শুধু বন্দুকটা বাবা বেচে দিয়েছিলেন। আর অয়েল পেইন্টিংখানা বোগে ঘরে টাঙিয়ে রাখেন।

ঠাকুরদার সেই বাঈজী? তিনি? তাকে দেখছেন আপনি?

হরি মা? বাঃ। তোমাকেও কোলে নিয়েছেন তিনি। নাম ছিল হরিমতি। অনেকদিন বেঁচেন তিনি। বাবা তাকে মায়ের সম্মানে রেখেছিলেন। বাবার মত আমরাও হরিমা বলে ডাকতাম। বয়স হলে তাকে কাশী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমিই মাসে পাঁচ টাকা করে মানি-অর্ডার করেছি। শীতে আর পুজোয় দশটাকা করে পাঠাতাম।

কথা হচ্ছিল—শান্ত গলায়। চারদিক চুপচাপ। বাইরে শীতের রাত। দোতলার বারান্দা ঘেঁষে একটা কি গাছ শিশিরে ভিজে গিয়ে খানিকক্ষণ অন্তর জলের ফোঁটা ফেলছে কার্নিশে। তার আওয়াজও শোনা যায়। কোন মানুষের কৃতী, খ্যাতিমান-সম্পন্ন হয়ে ওঠার প্রদীপটির নিচে উজ্জ্বল বাঈজীর কাহিনী যেমন থাকে—তেমনি থাকে তার কাশীবাসী হওয়ার পরেকার কয়েকটাকা মানিঅর্ডারেরও কাহিনী। সৌরভের মনে হল, আমি শিশুবয়সে যার কোলে উঠেছি—ঠাকুর্দার সেই হরিমা হয়তো কাশীতে দেহ রেখেছেন—কিংবা হারিয়েও যেতে পারেন। তার যৌবন বয়সের ঝাড় এখন শীতে—অন্ধকারে সিঁড়ির কোণে। এই শহরের রাস্তার ধারের বনঝাল কিংবা কচুবনেও বোধহয় একটা আধটা এমন কাহিনী পাওয়া যাবে।

লাবণ্য লক্ষ্য রাখছিলেন ব্রজ না আবার টিভি-তে ঝাউদিয়া রিলে স্টেশনের কথা তোলেন। কিছুই বলা যায় না। শেষে কি মাথাটি খারাপ হল? কথা ফুরিয়ে আসছে দেখে তিনি বললেন, যাও বউমা। সৌরভদের মশারিটা টাঙিয়ে দাও। আমি সুতুলি, পাড় সব টেবিলে দিয়ে দিতে বলেছি স্বপনকে। স্বপন? ও স্বপন? গেল কোথায়?

রমা উঠতে উঠতে বলল, ঘুমিয়ে পড়েছে।

সাত

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সৌরভের মনে হল, বাঃ! পৃথিবীটা কি টাটকা। বাগচিধামের ভেতর বাইরের দুনিয়া কোন দাঁতই বসাতে পারেনি। এখানে জায়গার অভাব নেই। এ-বাড়িতে এলে বাবা মা হাতে চাঁদ পান। বিকাশ আর অনুভা দিব্যি বন্ধু পেয়ে গেছে ডাকাবুকো স্বপনের ভেতর। স্বপন শ্যাওলা পড়া দেওয়াল বেয়ে দিব্যি জামরুল গাছের ডাল ধরে ওপরে উঠে যাচ্ছে। আর সেই জামরুল তলায় কাঠের মিস্ত্রি প্রাচীন সব কড়ি বর্গার ওপর র‍্যাদা চালিয়ে কাঠের গাছ থাকবার সময়কার ভেতর-রং ফুটিয়ে তুলছে—আঁশ, রেখা, নিয়মিত ফাঁকের পর একটা করে গোল চিহ্ন—সবই।

রোদ ভাল করে উঠতে ধুতি পাঞ্জাবির ওপর ঘিয়ে রংয়ের শাল চাপিয়ে সৌরভ বেশ বনেদী ঢংয়ে গিয়ে জামরুল তলায় দাঁড়াল। এ-বাড়িতে তার বেশ অনেক বছর আসা হয় না। এ-বাড়িতেই তার বড় হওয়া। এ-বাড়ি থেকেই সে দাদুকে—দিদিমাকে চলে যেতে দেখেছে। হঠাৎ তার চোখ আটকে গেল।

জামরুল গাছের গুঁড়ির মতই অতুল আলি সর্দার অনেকটা জায়গা নিয়ে র‍্যাদার ওপর ঝুঁকে পড়ছে—আবার পিছিয়ে এসে র‍্যাদাটাকে কোলের কাছে আনছে। লোকটা নিজেই যেন একটা লেদ মেশিন। অনেকগুলো পিস্টন, চাকা, স্ক্রু মিলিয়েই যেন মানুষটি। সকালবেলার মতই টাটকা দৃশ্য।

কী অতুলদা? অনেকদিন পরে—

এসে গ্যাছো। এই দ্যাখো তোমার বাবার কাণ্ড। এক একটা ঘর ভেঙে পড়ছে—আর আমি মাসভর চেয়ার, টেবিল বানিয়ে যাচ্ছি। কেন? না তোমার ছেলেমেয়েরা এলে বসবে। টেবিলে বই রেখে পড়বে।

বানাও কেন? বাবাকে বলে বেচে দেবার ব্যবস্থা করলে পারো।

ভাল কাঠ। দামী কাঠ। বেচলে অনেক পয়সাও আসতো। তাছাড়া আমার মজুরির টাকা দিতে ঘর থেকে পয়সাও বের করতে হোত না। দু'দিক থেকেই আশানী হোত।

বেচে দাওনা কেন অতুলদা—

খদ্দেরও এনেছিলাম ভাই। ভাল দামও দিত।

তাহলে দাও বেচে।

ওটি হবার নয় ভাই। তোমার বাবা বলেন, পয়সা দিয়ে কি হবে? পয়সা এলে তো খরচা করতে হবে। কোন্ রাস্তায় খরচা করবো?

তাই বলে গাদাগুচ্ছের চেয়ার টেবিল বানিয়ে কি হবে? পড়ে থাকবে তো অতুলদা।

তোমার বাবা বলেন, পড়ে থাকুক। আমার বাবা কড়িবর্গা বানিয়েছিলেন কাঠ এনে। এখন আমি বেচলে সে-দামের চেয়ে অনেক বেশিই পাবো। কিন্তু পয়সা তো থাকবে না। থাকলেও ব্যাঙ্কে পড়ে থাকবে। তার চেয়ে চেয়ার টেবিল হয়ে থাকুক। বিশ ত্রিশ বছর পরে ওই চেয়ার টেবিলই বেচলে অনেক টাকা পাবে সৌরভ।

কথাটা শুনে ভেতরে চমকে উঠলো সৌরভ। কাঠের দাম, জমির দাম, লোহার দাম কমে না। বাড়তেই থাকে। বাবা তো ভুল বলেনি! ব্যাঙ্কে টাকা যেমন লাফ দিয়ে বাড়ে—কাঠের দাম তার চেয়ে অনেক বড় বড় লাফ দিয়ে বাড়তেই থাকে। সৌরভ মুখে বললো, তাহলে বানিয়ে যাও!

ভেতর বাড়িতে সুন্দর ভাতের গন্ধ। মা শ্রীধরের অন্নভোগ চাপিয়েছে। বাগচিধামে পৃথিবী উনিশশো উনিশে এসে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ সৌরভের মনে পড়লো, সে যেখানেই যায় দেওয়ালে একটা ছোট পোস্টার দেখতে পায়। তাতে বড় বড় হরফে লেখা—আবার সাচ্চার যুগ আসছে। ওরকমই কোন একটা সাচ্চা সময় বাগচিধামে বন্দী হয়ে আছে। সেখানে বাবুয়ানা নেই—কিন্তু আবার

টাকারও কোন অভাব নেই। দোবেলা গৃহদেবতার পুজো হয়। জায়গার অভাব নেই। এখনকার পৃথিবী থেকে বাগচিধাম যেন আলাদা।

সৌরভ হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির প্রায় পেছন দিকটার ফুলবাগানটায় এসে দাঁড়াল। বোঝাই যায়—ওখানে কোণের দিকে একসময় কোন ঘর ছিল। এখন ঘর নেই। কিন্তু ঘাসে ঢাকা পড়ে আছে মাটির সমান সমান ঘরের ভিত। এখানেই এক সময় বিরাজি থাকতো। এখান থেকেই একদিন সন্ধ্যেবেলা বেরিয়ে সে আর ফেরেনি। আজ থেকে বহু—বহু বছর আগে।

সৌরভ জায়গাটায় হেঁটে চলে বুঝবার চেষ্টা করলো, এখান থেকে বিরাজি কিভাবে বেরিয়ে যেত সন্ধ্যেবেলা—তার তেজারতি কারবারের আদায় উসুল করতে। এখানে বিরাজি কীভাবে থাকতো, খেতো, ঘুমোতো—যার ঘরের সামনেই জেলা আদালতের একজন সফল উকিল বিশাল বাড়ি হাঁকিয়ে থাকতেন।

দুটো থিমই তাকে হন্ট করতে লাগলো।

একটা থিম ঃ একজন আশি অতিক্রান্ত মানুষ তার ছেলে-নাতি-নাতনীর জন্যে চেয়ার টেবিল বানিয়ে তার ভেতর ভবিষ্যতে মোটা টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন। এখন চেয়ারে নাও বসো—তো ভবিষ্যতে এই চেয়ার টেবিল তোমায় মোটা টাকা দেবে।

অন্য থিম ঃ গাঁ থেকে উঠে আসা একজন তরুণ উকিল, পসার হতেই জেলা সদরে একজন মেয়েছেলে তেজারতি কারবারীর কাছে জায়গা কিনে বাড়ি তুললো। সফল উকিল হয়ে সে তো একদিন সেই মহিলাকে বলতেই পারে—দ্যাখো বিরাজি। আমার বাড়িতে মান্যগণ্য মক্কেলরা আসেন। একই কম্পাউণ্ডের ভেতর ওকালতি আর তেজারতি চলতে পারে না। তুমি বরং অন্য কিছু কর।

গায়ে শালখানা ভাল করে দিয়ে শীতের রোদ আর ছায়ার ভেতর সৌরভ বাগচি নিজেকেই দেখতে পাচ্ছিল। ঝলমলে জামরুল পাতার

সবুজ—তরতাজা স্বপনকে ঘিরে বিকাশ আর অনুভা পৃথিবীর আদি কিশোরের মজা আর রূপ দেখতে দেখতে মজে যাচ্ছে—অতুল আলি সর্দার বয়সে বুড়ো হলেও শরীরে র‍্যাঁদা চালানোর আনন্দে বা জোয়ান থাকতে পেবে কাজের আহ্লাদে ডগমগ—এর ভেতর মানুষের গল্প খুঁজতে নেমে প্রায়-চুয়াল্লিশ সৌরভ বাগচি কোন আরশি ছাড়াই নিজেকে দেখতে পেল।

কোন এক নিস্তব্ধ সকালে গাছপালা বাড়িঘরের ভেতর নিজের চুয়াল্লিশ বছরের শরীরটা—তার রূপ—তার ভেতরকার মনকে দেখতে পাওয়া বিরাট এক বিস্ময়। আমার সামনে আমাদের এই পৈতৃক বাড়ির ভেতরে আমার মা লাবণ্য বাগচি—প্রায় আশি—শ্রীধর আর আমাদের জন্যে আজ নানারকম রান্নায় ব্যস্ত। আমার বউ রমা নিশ্চয় ঘরে ঘরে ঘুরে নানান ছবি দেখছে। এক এক দেওয়ালে এক এক ছবি। কোনটা আমার বড় পিসিমার—কোনটা আমার মেজো পিসির। বলা যায় বাগচিধাম এখন বাগচি মিউজিয়াম। সেসব ছবি দেখতে দেখতে রমা নিশ্চয় মনে মনে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে ওই সব ছবি তোলার সময়টায় চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। কারণ, সে সময়টা বাগচিধামে কেমন ছিল তা ও বানিয়ে তুলতে পারছে না।

অদৃশ্য আরশিতে নিজেকে যা দেখতে পাচ্ছিল সৌরভ তা হল—খেয়ে আনন্দ পাওয়া—নিজের শরীরটাকে নিজের বাইসাইকেল ভাবতে পারার আহ্লাদ মাখানো মুখশ্রী সমেত সে সুশ্রী দেখতে একজন মানুষ।

এই অবস্থাতেই তার ভেতরে ডায়ালগের পর ডায়ালগ ঢেউয়ের মতই আছড়ে পড়তে লাগলো। যেমন—

এক নম্বর থিম : বিরাট একখানা সিংহাসন মার্কা চেয়ার। যুবক বিকাশ সেখানা একজন খদ্দেরকে দেখিয়ে বলছে, এটা আমার বাবার ঠাকুর্দার চেয়ার। খাঁটি মেহগনি কাঠের। মেহগনি গাছ এখন আর নেই পৃথিবীতে। আপনাকে আমি চারহাজার টাকায় দিতে পারি।

খদ্দের বললো, আর আছে ?

আরও আছে। আমাদের ঠাকুর্দা আমাদের জন্যে বানাতেন। বাড়ির কাছেই কাঠের মিস্ত্রি ছিল।

সবই মেহগনির ?

শুধু মেহগনি। আসলে জানেন কি—আমার বাবার ঠাকুর্দার একজন বার্মিজ ক্লায়েণ্ট ছিলেন। তিনি মান্দালয়ের জঙ্গল থেকে গাছ কাটিয়ে জাহাজে করে পাঠিয়েছিলেন। বাবার ঠাকুর্দা সেইসব কাঠ দিয়ে ছাদের কড়িবর্গা করেন। সেই কড়িবর্গায় র‍্যাঁদা চালিয়ে ঠাকুর্দার মিস্ত্রি ওইসব চেয়ার বানান।

অত দামী কাঠে র‍্যাঁদা বসায় কেউ ?

আর বলবেন না! আমার ঠাকুর্দা ওসব পরোয়া করতেন না।

খদ্দের বলল, মেহগনি কাঠের একটি চোকলার দামই হবে এখন দশটাকা।

বিকাশ বলল, শুনলে আশ্চর্য হবেন—সেই চোকলা জ্বালিয়ে তাতে ধূপ ছড়িয়ে ঠাকুরমা ঘরে ঘরে ধুনো দিতেন।

বলেন কি মশাই? মেহগনির চোকলা দিয়ে ধুনো দেওয়া! আপনার ঠাকুরমা তো বাবুয়ানায় বর্ধমানের রাজবাড়িকেও ছাড়িয়ে যেতেন!

ঠিক এই সময় ক্যামেরা গিয়ে দেওয়ালে পড়বে। সেখানে ঝোলানো ক্যালেণ্ডারে সাল,লেখা—১৯৫৯। ক্যালেণ্ডারের ওপরেই একখানি ফটো। ব্রজ বাগচি সেখান থেকে খদ্দেরের দিকে তাকিয়ে। মুখে হাসি।

দুনম্বর থিমের ডায়ালগ একদম গঙ্গার বানের মত এসে পড়তে লাগলো। বাইরে পৃথিবী এত সুন্দর। শীতের বাতাসে জামরুল পাতাগুলো হুল্লোড় তুলে উল্টে পাল্টে যাচ্ছে। বাগচিধামের নিজের একটা ছায়া উকিলপাড়ায় অনেকটা জুড়ে পড়েছে। এই উকিলপাড়া

আসলে—সৌরভ মনে মনে হিসেব কষে বুঝতে পারে—প্রথম মহাযুদ্ধের পরেকার জেলা শহরের সফল উকিলদের বসতি—যাঁরা কিনা স্বাধীনতা অব্দি টেনেটুনে রমরমায় ছিলেন—তার পরই এক হ্যাঁচকায় সময়টা একদম পালটে গেল। সবাই যে যার মত ছড়িয়ে পড়লো। বাঁধনগুলো আলগা হয়ে গেল। এই বসতির শুরু যাঁদের দিয়ে—তাঁরা গত শতাব্দীর প্রায় বারো আনা কেটে যাবার পর জন্মেছিলেন। তাঁরা কেউ আর নেই। তাঁদের ছেলেরাই এখন মর্নিং ওয়াক করে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখছে। যেমন কিনা আমার বাবা শ্রীব্রজ বাগচি। কোন কোন বাড়ির ভীষণ বুড়ো বাবা মা পড়ে আছে। মানিঅর্ডার আসে। চাকুরে ছেলে আসে না। তারা কলকাতা, দুর্গাপুর, দিল্লি মার্গারিটায় থাকে। আগে তারা বিজয়ার পর চিঠি লিখতো। এখন তারা তাও লেখে না। বুড়ো বুড়ি ছাড়া যা কিছু অল্প বয়সী নিরুপায় বংশধর আছে—তারা অর্ডার সাপ্লাই করে। একাঙ্ক নাটক করে। কেউ কেউ পার্টি করে। কেউবা মাথায় লম্বা চুল রেখে সিঁদুরের টিপ পরে সোনার দোকানে কোষ্ঠীবিচার করে পাথর দেয়। আবার কেউবা নিরম্বু বেকার। নিজের বসতবাড়ির জায়গা বিক্রির চেষ্টা করে। নয়তো মোহিতনগরের দিকে দালালী করে। দু'একজন কবিতা লেখে।

এরা সবাই সৌরভের চেয়ে বয়সে ছোট। ওদের চোখে সৌরভ একজন সেলিব্রিটি। যেকোন দিন সৌরভ—ওদের অঙ্কে—ভয়ঙ্কর ফেমাস হয়ে যেতে পারে। তাই সৌরভের সঙ্গে দেখা হলেই ওরা অনেকটা দাঁত বের করে ভীষণ ভদ্র হওয়ার চেষ্টা করে। এদের বাড়ির মেয়েদের যেনতেনভাবে বিয়ে হয়। যাদের হয় না—তারা জেলা পরিষদ অফিসে ক্যাজুয়াল ফোর্থক্লাশ স্টাফ। পাকা চাকরির দাবিতে মিছিলে যায়।

অসম্ভব সিরিয়ালমনস্ক সৌরভ বাগচি এবার ডায়ালগের বানে ভেসে গেল। একটার পর একটা ডায়ালগ এসে তার মাথার ভেতর ভেঙে

পড়ছে। সেইসব ভাঙা ডায়ালগের ওপর আবার ডায়ালগ এসে পড়ছে।

বিরাজি ঃ কি ব্যবসা করবো আপনিই বলে দিন উকিলবাবু।

মোহিত ঃ আমি কি করে বলবো। কতই তো ব্যবসা আছে।

বি ঃ আগে যাতে ছিলাম—তাতে যাই!

মো ঃ সে বয়স তো পেরিয়ে এসেছো বিরাজি।

বি ঃ এসেছি কি!—বলে বিরাজি তাকালো। দুই চোখের কোণা দিয়ে। সে চোখে তাকাতে পারলেন না মোহিত বাগচি। এখানে ক্যামেরায় প্রথম দেখাতে হবে বিরাজির তাকানো। তারপর দেখাতে হবে মোহিতের চোখ নামানো মুখ। শেষে একই ফ্রেমে দু'খানি মুখ রাখতে হবে। এই সময়টায় তিন সেকেণ্ডের জন্যে বেহালায় ছড় ঘষে টানতে হবে—নিচু থেকে ওপরের দিকে।

মো ঃ মুড়ির কারবার কর।

বি ঃ তাতে আর ক'পয়সা! কিন্তু উকিলবাবু, এমন তো কথা ছিল না। বলেছিলেন, যতদিন বাঁচবে বিরাজি—তোমার ভিটেতে তুমি থাকবে। যাতায়াতের পথ তো যেমন রয়েছে তেমন থাকবে। আমার গেট দিয়েই আসবে যাবে।

মোহিত চুপ করে মাটির দিকে তাকিয়ে।

বি ঃ উকিলবাবু। আপনার কথায় সবটা লিখে দিলাম। ভাগ্যিস তিনশতক জায়গা ছাড়িনি। সেটায় কোণের দিকে নিজের কুঁড়েতে পড়ে আছি সারাদিন। সন্ধ্যে হলে আদায়উসুলে বেরুই। এ শহরের বড় বড় মানুষের নাড়িনক্ষত্র জানে এই বিরাজি দাসী।

এবার যেন বিরাজির গলায়—চোখে শাসানি।

মো ঃ আঃ! তোমার জায়গায় তুমি আছো। তুমি কারও খাও না, পরো?

বি ঃ আমিও তো তাই জানতাম উকিলবাবু!

মো : আমি শুধু বলেছি—এবার তোমার কারবারটা পালটাও। বয়স তো হচ্ছে।

বি : কি বা বয়স আমার। বে-থা করিনি। পেটে ধরতে হয়নি। যেমন ছিলাম তেমনই তো আছি। ভাঙচুর তো কিছু হয়নি আমার। হবেই বা কি করে? ঘরসংসার গেরস্থালী তো কোনদিন করিনি কারও।

মো : যেমন ছিলে তেমন তো আর নেই তুমি। নিজেরটা কেউ দেখতে পায় না। ভাবে—যেমন ছিলাম, তাইই বুঝি আছি!

বি : সে বলতে গেলে তো উকিলবাবু আপনি আর সেই উকিল-বাবুটি নেই।

মো : নেই-ই তো বিরাজি।

বি : এসেছিলেন আলকাপের দলের একটি কালো কোট হাতে। আর মাথায় কিছু বুদ্ধি নিয়ে। ক'বছরে জায়গা হল। বাড়িঘরদোর হল। তির-তিনখানা মেয়ে হল।

মো : বদলে তো গেছিই বিরাজি। চিরদিন কেউ একরকম থাকে না। কে জানতো দায়রা আদালতে এমন ধাঁ-ধাঁ করে পসার হবে। তাই তো তোমায় ওকথা পাড়া। নানারকমের মক্কেল আসে তো। তাদের মুখ চেয়ে বলা—

বি : সময় থাকতে বুদ্ধি করে জায়গাটা লিখিয়ে নিয়েছিলে। বুদ্ধিও আপনার আছে উকিলবাবু।

মো : তোমায় তো ঠকাইনি বিরাজি। যা দাম ঠিক হয়েছে—তাই দিয়েছি।

বি : একবারে দিলে টাকাটা মোটা সুদে খাটানো যেত।

মো : তখন কী বা আর করি! তুমি কিস্তিতে রাজি হলে তাই জায়গাটা হল। জায়গা ছিল বলে বাড়িও হয়ে গেল।

বি : এবার উকিলবাবু বলুন—বউ ছিল বলে তিন-তিনটে মেয়েও হয়ে গেল।

মো ঃ চটে যাচ্ছো কেন বিরাজি। বিয়ে সংসার করলে তো মানুষের ছেলেমেয়ে হয়ই। আমারও তাই হয়েছে।

ক্যামেরা এবার বিরাজির চোখের নিচে গিয়ে থামল।

বি ঃ শুধু আমারই কিছু হল না।

মোহিত চুপ করে আছে।

বি ঃ পসার হল তো আমায় কারোবার বদলাতে বলছেন। তা আপনার নিজের ঘরের দিকেও তাকান তাহলে!

মো ঃ কি?

বি ঃ পসার হয়েছে। এবার তাহলে হরিমাকে নিয়ে কি করবেন? হরিমতি দাসী। সাকিন—বেনারস।

মো ঃ ছিঃ! বিরাজি। তিনি আমার মায়ের মত। মায়ের সম্মানে আমার কাছে থাকেন।

বি ঃ বাপের মেয়েমানুষ তো! তাই। পসার হলেও মাথায় করে রাখা যায়! হরিমা থাকলে পসারে আটকায় না? কি বলেন!

মো ঃ ছিঃ! বিরাজি। তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই।

বি ঃ পসারের খাতিরে তাহলে এবার হরিমাকে কাশী পাঠিয়ে দিন দিকি।

মো ঃ নিজেই তিনি কিছুদিন হল কাশীবাসী হতে চাইছেন।

এখানে ফেড্ আউট ও ফেড্ ইন। নতুন দৃশ্য ফুটে উঠবে।

চুয়াল্লিশ বছরের সৌরভ বাগচি প্রায় আট বছরের বালকের মতই ছুটতে ছুটতে ভেতর বাড়িতে এল। তাকে ছুটে আসতে দেখে লাবণ্য চেঁচিয়ে উঠলেন। ভয়ও পেলেন। চৌকাঠে জুতো আটকে উলটে পড়তে পারে। বয়স হচ্ছে। পড়লে ভীষণ ব্যথা পাবে। এ বাড়িতে সৌরভ থাকে না প্রায় বিশ বছর। তাই চলাফেরায় আগের মত সড়গড় নয়।

সৌরভ হাঁপিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লো। পড়েই বললো, আচ্ছা মা, আমাদের দাদু কেমন মানুষ ছিলেন?

শ্বশুরমশায়? সাক্ষাৎ মহাদেব।

সৌরভের লজ্জা করছিল। তবু সাহস করে বলেই ফেলল, চরিত্র?

ভয়ঙ্কর দৃঢ়। আমি বিয়ে হয়ে এসে তাঁকেই নিজের বাবা মনে করেছি। অমন মানুষ হয়না। তুই তো দেখেছিস। খুব ন্যাওটা ছিলি তাঁর।

তখন তো বলতে গেলে বালক ছিলাম। কি বা বুঝি। আচ্ছা, হরিমা?

দাদাশ্বশুরের জিতে-আনা হরিমতি দাসী? আমায় খুব স্নেহ করতেন। তোকেও কোলে নিয়েছেন।

সে তো আমার মনে থাকার কথা নয় মা। কেমন দেখতে ছিলেন?

ফর্সা। লম্বা। তা আমিও যখন দেখেছি— তখন তিনি চলাফেরা করেন। নিজের মায়ের মত করে রেখেছিলেন তাঁকে—তোমার দাদু। খুব সুন্দরী ছিলেন।

সৌরভ বুঝলো, সঠিক জবাব পাওয়া যাবে না। সে যা জানতে চেয়েছে—তার কোনকিছুই তার মায়ের মাথায় আসছে না।

আচ্ছা মা, বিরাজি কেমন ছিল?

এতকাল পরে এসব কথা কেন?

মনে এল তাই বললাম।

বিরাজিকে আমি দেখিইনি। তোমার বাবারই আবছা মত স্মৃতি আছে। তোমার ঠাকুরমার মুখে শুনেছি—বয়সকালে নাকি একটা আলগা লাবণ্য ছিল। আঁটোসাঁটো গঠন-গাঠন ছিল। তা এক সন্ধ্যে-বেলা আদায়ে বেরিয়ে আর ফেরেইনি।

অনেকের কাছে টাকা পেতো। অনেকের সোনাদানা বন্ধক রাখতো। কেউ খুনটুন করেনি তো?

করে দিতে পারে। এতদিনকার কথা। তবে পুলিস নাকি ওর ঘরের সামনে ওই ফুলবাগানটা খুঁড়ে দেখেছিল। কিন্তু কোন লাশ পাওয়া যায়নি। কতদিনকার কথা। এখন তো কিছু জানারও উপায় নেই। আমার কি মনে হয় জানিস?

কি মা ?

পুরী যাবে বলে তৈরী হচ্ছিল তো—

হ্যাঁ। তা কি? সৌরভ অস্থির হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো। লাবণ্য খুব অবাক হলেন। ছেলের মুখে তাকিয়ে বলেন, তোর হয়েছে কি সৌরভ ?

কিচ্ছু না।

জ্বরটর হয়নি তো ঠাণ্ডা লেগে? —বলতে বলতে লাবণ্য ছেলের বুকে হাত রাখলেন। ইচ্ছে, পাঞ্জাবির ভিতর দিয়ে সৌরভের বুকে হাত রাখবেন।

মায়ের হাত সরিয়ে দিয়ে সৌরভ বলল, না না। ওসব কিছু হয়নি। বলোই না, কি মনে হয় ?

আদাযে উসুলে বেরিয়ে হঠাৎ মনটা তার বিবাগী হয়ে যায়—

যাঃ তাই হয় নাকি কখনো ?

হয় রে হয়। লালাবাবুর গল্প শুনিসনি। সেই যে বেলা পড়ার বেলায়—

তা হয় নাকি! বিরাজি কেন বিবাগী হতে যাবে। তেজারতি কারবার করে—

হতে পারে। হয়তো কারও একটা কথা শুনে ধা করে মনটা একদম খুলে গেল। চোখের সামনে জগৎ সংসারের আসল চেহারা দেখতে পেয়ে সেই তখন তখনই পায়ে হেঁটে পুরী রওনা দিল। পড়ে থাকলো ঘরদোর—তেজারতি কারবার—তার ফলাও সুদ—ভাল তো কাটায়নি জীবনটা—

কেমন কাটিয়েছে ?

আমার শাশুড়ি তো বলতেন, বয়সকালে কোন গুণের ঘাট ছিল না। কাকে যেন বিষ খাইয়ে মেরেই ফেলে বিরাজি। শেষে তোর ঠাকুর্দা বিরাজিকে বাঁচিয়েছিল। নয়তো—

তাই তো বলছিলাম—আমার ঠাকুর্দার চরিত্র কেমন ছিল ?

মহাদেবের মত। অমন মানুষ হয় না। তুই এত উত্তেজিত কেন সকাল থেকে? কিছু হয়েছে নাকি বউমার সঙ্গে?

কি হবে! তুমিও যেমন মা।

না। অত চেঁচিয়ে-অস্থির হয়ে কথা বলছিস কি-না— তাই ভাবলাম....

—না না ওসব কিছু নয়। তুমি বলছো—মোহিত বাগচি মহাদেবের মত মানুষ ছিলেন।

ছিলেনই তো। আমি একশোবার বলবো—তিনি মহাদেবের মত মানুষ ছিলেন। কেন? তুইও তো দেখেছিস। তিনি রুগী দেখে ওষুধ দিতেন। তুই পুরিয়া তুলে তুলে রুগীদের হাতে দিতিস

সে তো আমি বাচ্চা ছিলাম। দাদু গম্ভীর হয়ে সারাদিন নিচের বারান্দায় চেয়ারটায় বসে থাকতেন। সকালে শুধু রোগী দেখে ওষুধ দিতেন।

তখন তাঁর তিন মেয়েই বিধবা হয়ে ফিরে এসেছেন বাপের বাড়ি। বাবাও ওকালতি ছেড়ে দিলেন মস্ত পসারের মাঝখানে। কথা বলাও ছেড়ে দিলেন। যে বাড়ি সারাক্ষণ আনন্দ-হইচইতে ভরে থাকতো—সে-বাড়ি শ্মশান হয়ে গেল। ঠাকুর জামাইদের হাঁকডাকে—নাতি-নাতনীদের হইচইতে গমগম করতো এ-বাড়ি একদিন। তুইও দেখেছিস। বাবার রহমতপুরের প্রজারা এসে ডাল, গুড়, চাল, আম, তামাক দিয়ে যেতো। মা আমাকে নিয়ে শ্রীধরের পাশের ঘরে সব গুছিয়ে রাখতেন।

তখন আমি খুবই ছোট। বড় পিসেমশায়ের গোঁফজোড়াই মনে আছে শুধু। কয়েকটা বড় বড় কড়াই দেখেছিলাম পরে। শুনেছি পিসেমশাই কবিরাজী ওষুধ জ্বাল দিতেন সেসব কড়াইয়ে।

হ্যাঁ। বাবা বড় ঠাকুরজামাইকে কবিরাজী পড়িয়ে ভিষগ্‌রত্ন করেছিলেন। কবিরাজী ওষুধ তৈরির কারখানা করে দিলেন। নাম দিলেন ঐশ্বর্যময়ী ঔষধালয়। সে কী ধুমধাম!

আচ্ছা মা—ঠাকুর্দার সঙ্গে ঠাকুমার রিলেশন কেমন ছিল?

রিলেশন? যেমন থাকবার তেমন ছিল। অমন শ্বশুর-শাশুড়ি অনেক ভাগ্যে পেয়েছিলাম বাবা।

সৌরভ বললো, থাক। আর বলতে হবে না। —সে বুঝলো, যা জানতে চাইছে—তার বিন্দুবিসর্গও মা বলতে পারবে না।

সৌরভ বারান্দায় বেরিয়ে এল। মোহিত বাগচির সিংহমার্কা বিশাল চেয়ারটা ঠাণ্ডা বারান্দার ভেতর খালি পড়ে আছে। রুগীদের বসবার বেঞ্চগুলোও পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর খালি পড়ে আছে। এ বারান্দায় বিশালদেহী নির্বাক মানুষটি সারা দিনরাত চুপচাপ বসে থাকতেন। মাঝে-মধ্যে চুপচাপ পায়চারি করতেন। জীবনের শেষ প্রায় বিশ বছর কারও সঙ্গে বড় একটা কথা বলেননি তিনি।

সৌরভ বাগচির মন বললো, জীবনে যা ঘটে তাই-ই শিল্প নয়। যা ঘটলেও ঘটতে পারে—তাই-ই তো শিল্প। ভাগ্যিস সারাটা জীবন জুড়ে আমাদের সংশয় আছে—তা না থাকলে জীবনটাই বাসি আটার রুটি হয়ে যেতো। যা হলেও হতে পারে তারই খাঁজে খাঁজে তো সংশয়ের গুঁড়ো ছড়ানো থাকে। সেই সংশয়ে পড়ে উদ্বেগে, আবেগে, আনন্দে আমাদের ভেতরকার সত্যটা বেরিয়ে পড়ে।

সৌরভ দেখলো, আস্ত একটা লেদ মেশিনের মতই অতুল আলি সর্দার একটা বড় বর্গাকে পেড়ে ফেলেছে। এই বর্গাটা মান্দালয়ের জঙ্গলের বিশাল একটি গাছের শরীর ছিল। জাহাজে চড়ে সে কলকাতায় আসে। তারপর মালগাড়িতে এখানে। মোহিত বাগচি তাকে ছাড়িয়ে এনে সাইজমত বর্গা বানিয়েছিলেন মিস্ত্রি দিয়ে। তা আশি-নব্বই বছর আগে। এখন আবার সে সাইজ হচ্ছে। আমার ছেলেমেয়েদের চেয়ার-টেবিল হবে বলে। ব্যবহার না হলেও—এতই দামী কাঠ—বিশ-পঁচিশ বছর পরে আবার বিক্রি করা যাবে।

স্বপন রেলইঞ্জিন সেজে কম্পাউণ্ড ওয়ালের সরু পাঁচিলের ওপর

দিয়ে হুইসিল দিতে দিতে চলে গেল। পেছন-পেছন অপটু বিকাশ আর অনুভা।

বাবা কোথায় ? এতক্ষণে নিশ্চয় মর্নিং ওয়াক করে ফিরেছেন।

হঠাৎ সৌরভ বাগচিধামের ভিতের ভেতরকার প্রাচীন হিম টের পেল। মাটির কত গভীরে কতকাল আগে এই বাড়ির চল্লিশ ইঞ্চি কি আরও বেশি চওড়া ভিত গাঁথা হয়েছিল। প্রাচীনতার একটা হিম আছে। অতীতের একটা শীত থাকে। সেই শীত যেন সৌরভের শরীরের মাংসের নিচে গিয়ে হাড় ছুঁয়ে দিল। সঙ্গে কনকন করে ওঠায় সে দাঁড়িয়ে পড়লো।

আমাদের হাড়ে এক নির্ধূম আনন্দ আছে জেনে পঙ্কিল সময়স্রোতে
চলিতেছি ভেসে।
তা না হ'লে সকলি হারায়ে যেতো ক্ষমাহীন রক্তে—নিরুদ্দেশে।
তবুও যখন মৃত্যু হবে উপস্থিত
আর একটি প্রভাতের হয়তো বা অন্যতর বিস্তীর্ণতায়,
—মনে হবে অনেক প্রতীক্ষা মোরা ক'রে গেছি পৃথিবীতে
চোয়ালের মাংস ক্রমে ক্ষীণ ক'রে কোনো এক বিশীর্ণ কাকের
অক্ষি-গোলকের সাথে আঁখি-তারকার সব সমাহার এক দেখে ; তবু
লঘু হাস্যে—সন্তানের জন্ম দিয়ে—
তারা আমাদের মতো হবে—সেই কথা জেনে –
ভুলে গিয়ে—
লোলহাস্যে জলের তরঙ্গ মোরা শুনে গেছি আমাদের প্রাণের
ভিতর—
নব শিকড়ের স্বাদ অনুভব ক'রে গেছি ভোরের স্ফটিক রৌদ্রে।
এখানে সরোজিনী শুয়ে আছে ঃ
জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা।

আট

বারো নম্বর ওয়ার্ডে আপনাকেই দাঁড়াতে হবে। আপনাকেই আমরা কমিশনার করতে চাই।

আমি কমিশনার দাঁড়াবো? খেপেছো! তিরিশ বছর আগে এলে পারতে। বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

তিরিশ বছর আগে তো মোহিতনগর গড়েই ওঠেনি সেভাবে। মিউনিসিপাল ভোটে মোহিতনগরের বারো নম্বর ওয়ার্ড হল এই তো মোটে সাত আট বছর।

একতলার টানা বারান্দায় ব্রজ বাগচি দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর তার বাবার চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে রোদ পোহাচ্ছিলেন। এমন সময় মোহিতনগরের নাগরিক কমিটির মেম্বাররা এসে হাজির। ওরা মোহিতনগর কথাটা এমনভাবেই বলে—যেন মোহিতনগর অনেকটা কৃষ্ণনগর, বেথুয়াডহরি কিংবা রানাঘাট। আর পাঁচটা জায়গার মতই মোহিতনগরও একটা জায়গা।

ওরা ফিরে গেলে ব্রজ বাগচি ভাবছিলেন—ভাগ্যিস বাবা খড়ে নদীর গায়ে নাবাল জায়গাটার বন্দোবস্ত নিয়ে চাষে নেমেছিলেন—ভরা ধান বানে ডুবেছিল—তাই জায়গাটা বসতি হয়ে গেল। সেখানে রাস্তা, স্কুলবাড়ি, থাকার জায়গা হয়ে যাওয়ায় অনেক লোকের সুখদুঃখ মিশে গিয়ে নাম হয়ে গেল মোহিতনগর। ভগবানের কি খেলা! হয়ে গেল বারো নম্বর ওয়ার্ড। ভোটার। কমিশনার ড্রেন। লাইটপোস্ট।

হঠাৎ মোহিত বাগচির বসবার বন্ধ ঘর থেকে আওয়াজ পেয়ে ব্রজ বাগচি চমকে উঠলেন, কে ওখানে?

আমি সৌরভ। কতদিন খোলা হয় না ঘর? ভ্যাপসা গন্ধ হয়ে গেছে।

কতদিন ও ঘর খোলা হয়নি তা মনে করতে পারলেন না ব্রজ বাগচি। কতদিন পরে বাবার ঘরে একজন লোক। তাও আর কেউ নয়। সৌরভ। তবে কি বাড়িটা আবার জেগে উঠলো? আগেকার মত ঘরে ঘরে আলো জ্বলবে ফের? বড়দি এই বারান্দায় বসে ভি পি ছাড়াতো পিওনের কাছ থেকে। বড়দির বিয়ের আগের অভ্যেস। পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখে বড়দি চিঠি পাঠাতো। আজব দেশলাই, রঙীন সাবান, পোকা মারার তিনটি উপায় নামের এক বাক্স ছাড়াও নানারকম জিনিস আসতো বড়দির নামে। বড়দি ওই জানলা দিয়ে বাবার দিকে হাত পাততো।

বাবা বলতেন, আবার! কত?

সাত টাকা পাঁচ আনা।

ব্যস্! এই নাও—বলে বাবা তার ড্রয়ার থেকে মক্কেলদের দেওয়া টাকায় হাত দিতেন। তারপর টাকাটা এগিয়ে দিতেন তার বড় মেয়েকে। টাকা পেয়ে পিওন চলে গেলেই বড়দি বড় বড় চোখে খুশি ছড়িয়ে প্যাকেট খুলতো। কী আনন্দ। প্যাকেট থেকে বেরুতো কখনো একটা বড় দেশলাই- কিংবা ছোট একটা টিনের কৌটো। নয়তো একডজন রুমাল। একবার এসেছিল বড় এক কৌটো আসল চীনা সিঁদুর।

ফাঁকা বারান্দায় শীতের পড়ন্ত রোদ জানিয়ে দিল এ বাড়িতে সেসব দিন আর আসবে না। জীবনের আরেকটা দিন চলে যাবার পথে। শীতে সন্ধ্যা আসে আগে আগে। জামরুল তলায় অন্ধকার গুঁড়ো ঝির-ঝির করে জমা হচ্ছেই। অতুলকে আর দেখা যাচ্ছে না। স্বপন কোথায় গেল? লাবণ্য? বিরাজির ঘরের দিককার ফুলবাগান একটু পরে সন্ধ্যার সঙ্গে মিশে যাবে।

ব্রজ বাগচি উঠে পড়লেন। দোতলায় এসে নিজের ঘরে নিজে নিজেই আলো জেবলে দিলেন। অন্য সময় লাবণ্য জেবলে দেয়। আজ লাবণ্য কোথায়? নিশ্চয় বিকাশ আর অনুভাকে নিয়ে পড়ে আছে।

এ বাড়িটা এত বড়—এক এক জায়গার কথা আর এক জায়গায় টের পাওয়া যায় না।

ব্রজ বাগচি চেয়ার থেকে শালখানা তুলে নিয়ে গা ঢেকে নিলেন। তারপর নবটা ঘুরিয়ে দিলেন টিভি-র। সঙ্গে সঙ্গে টিভি-র পর্দায় একটি মেয়ের মুখ ভেসে উঠলো। সে বলতে থাকলো ঃ এখন থেকে—তারপর সাউন্ড অফ হয়ে গেল। কিন্তু মেয়েটির ঠোঁট নড়তে লাগলো। হঠাৎ মেয়েটি কথা ফিরে.পেল। অমনি তিনটি কথা ভেসে উঠলো—রহমতপুর বিলে স্টেশন—

মেয়েটি মুছে যেতেই টিভি-তে ভেসে উঠলো মাঠ। তাতে মেপে মেপে বসানো ডাঁটো সব তামাক গাছ সবুজ দামী পাতা ছড়িয়ে নাচের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো। মানুষ সমান গাছগুলোর ভেতর দিয়ে হেঁটে আসছে একজন। হাঁটু অব্দি ধুলো। ধুতি অনেকটা তোলা। পা দেখেই চিনলেন ব্রজ বাগচি। গোদা গোদা।

বাবা—

ছবির মোহিত বাগচি কোন জবাব দিলেন না। এই বছর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বয়স হবে। ধুতির ওপর ঢোলা ফতুয়া। বাঁহাতে ডাগরডোগর অনেকগুলো তামাক পাতা। সবুজ। সদ্য তোলা।

তামাক ক্ষেত পেরিয়ে মোহিত বাগচি একটা বারান্দায় গিয়ে উঠলেন।

ব্রজ বলে উঠলেন. কাছারিবাড়ি। পেছনেই মাছের পুকুর।

মোহিত বাগচি বারান্দায় দাঁড়িয়ে, যেন আস্ত একটা শালগাছ। মাথা টিনের চালের আড়ায় গিয়ে ঠেকেছে প্রায়। সেখানে দাঁড়িয়েই ভরা গলায় ডাকলেন, হরিমা—ও হরিমা—

চৌচালা কাছারিবাড়ির পেছনের ঘোরানো বারান্দা দিয়ে ধীরে সুস্থে এক মহিলা বেরিয়ে এলেন। গায়ের রংয়ের সঙ্গে সাদা থান মিশে গেছে। মাথাটি কাঁচাপাকা। চোখে চশমা।

ব্রজ বাগচি বলে উঠলেন, হরিমার তখন পঞ্চাশ হয়নি।

মহিলা মোহিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, কেয়া রে বেটা—?

ব্রজ দেখলেন, তার বাবা গলা নামিয়ে বলছেন, হরিমা—তুমি যে তাম্বাকু খাও—সেটা ভাল নয়। এখন থেকে তুমি রহমতপুরের ক্ষেতের তামাকু খাবে।

তোর মত বেটা থাকতে আমার চিন্তা কিসের!

মোহিত বললেন, এ পাতাগুলো বেছে বেছে তুলেছি। ভাল মত শুকিয়ে গুঁড়ো করে তোমার মিশির কৌটোয় রেখে দেওয়া হবে। খুব ঝাঁঝ কিন্তু এ তাম্বাকুতে। কম খেও হরিমা—

আজকাল তো দু'বারের বেশি নিই না বেটা। ছিলম্ বানারসী। তোর বাবা নিয়ে এসে করে দিল বঙ্গালীন্।

হরিমা। তুমি রোটি খেতে ভালবাসো—তাই এবার তোমাদের গেঁহু লাগালাম রহমতপুরে—

আর ভালবাসা!—বলতে বলতে হরিমা একটা টুলে বসে পড়লেন।

ব্রজ বাগচি দেখলেন, রহমতপুরের কাছারিবাড়ির গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে বিচুলি বোঝাই গো-গাড়ি ক্যাচোর-কোচোর শব্দ তুলে যাচ্ছে। সময়টা বোধহয়—রহমতপুরের কোন শীতের দুপুর। ব্রজ চেঁচিয়ে লাবণ্য লাবণ্য বলে ডাকতে যাচ্ছিলেন। কতদিন আগেকার সব জিনিস টিভি-তে ভেসে উঠছে। আশ্চর্য! কিন্তু চেঁচাতে পারলেন না। পাছে লাবণ্য ছুটে এসে বলে, আঃ! চেঁচিও না। তোমার মাথাটি গেছে। সৌরভ যদি বোঝে—বাপের মাথাটি গেছে—তাহলে কিন্তু সে একটি বেলাও এখানে থাকবে না। রিক্সো ডেকে মালপত্তর নিয়ে স্টেশনে চলে যাবে।

একদম হারিয়ে যাওয়া এসব দৃশ্য একা দেখতে ভাল লাগে কারও। এইমাত্র রহমতপুরের যে সময়টা ভেসে উঠেছিল—তখন ব্রজ বাগচি মনে মনে হিসেব কষে দেখলেন—তিন দিদির পর তার বয়স ছিল পাঁচ ছ'বছর। যে দুনিয়া আর কোনদিন ফিরে আসবে না—এইমাত্র তা

দেখতে পেয়েছেন ব্রজ বাগচি। টিভি-র কী মহিমা! কেউ জানে না—অথচ আমি জানি—নতুন রিলে স্টেশনগুলো—ঝাউদিয়া, রহমতপুর, মোহিতনগর।

সুইচ টিপলো সৌরভ। আলোটাও বলিহারি। এ নিশ্চয় উনিশশো আটত্রিশ সালের ঈগল কেম্পানির বালব্। আলোটাও ফেলছে যেন সুদূর উনিশশো আটত্রিশ থেকে। খটকা লাগলো সৌরভের। সে মোহিত বাগচির পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে ভাবলো—এখানে সুদূর হবে? না, সু-অতীত? কিংবা দূর-অতীত? আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও আগে মোহিত বাগচি ওকালতি ছেড়ে দিয়ে গম্ভীর হয়ে যান। তিন তিনটি জামাই মারা যাওয়ায় তিনি ওকালতি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসে যান। কিশোর হতে হতে সৌরভই দেখেছে-দাদু কথা বলেন না। বারান্দায় বসে থাকেন চুপচাপ। হোমিওপ্যাথির ওষুধ দেন রুগীদের। সেই ওষুধের পুরিয়া বালক সৌরভ রুগীদের হাতে তুলে দিত। সেই অল্প বয়সেই সে দাদুর পুরনো পঞ্জিকার স্ট্যাকে পাতা উল্টে যে-সব জিনিসের বিজ্ঞাপন দেখেছিল—তার ভেতর ঈগল কোম্পানির নামটা পরিষ্কার মনে আছে সৌরভের। পাতা জোড়া বিজ্ঞাপনে একটি বালব্-এর ছবি। তাতে কালি দিয়ে আঁকা বিদ্যুতের ছটা।

সৌরভ নিজের আবিষ্কারে নিজেই অবাক হয়ে যায়। জোরালো আলোর ছটা বোঝাতে কালো কালির রেখা আঁকতে হয়েছে বালব্ ঘিরে। কালো অন্ধকার দিয়ে আলো বোঝাতে হয়?

আমি কি তাহলে এই অন্ধকার ঘরে খুঁজতে খুঁজতে আসল মোহিত বাগচিকে খুঁজে পাবো। গৌরী বাগচি দিলদার খরচে-মানুষ ছিলেন। তার ছেলে মোহিত বাগচি কষ্টে-সৃষ্টে আইন পড়ে ওকালতি করে জেলা আদালতে উঠে আসেন। শহরে ঘরবাড়ি করেন। রহমতপুরে চাষ-আবাদ। ঝাউদিয়ায় পুজোপার্বণ দোলদুর্গোৎসব। খড়ে নদীর গায়ে

শেষমেষ মোহিতনগর। অবশ্য তার মৃত্যুর পরেই জায়গাটার নাম হয় মোহিতনগর। মোহিত বাগচির জীবনে সাফল্য আর ব্যর্থতা। উজ্জ্বল, সাহসী, কর্মবীর মোহিত। আবার গম্ভীর, নির্বাক, সারাদিন চুপচাপ বসে থাকা মোহিত। এই দুই মোহিতকে নিয়েই তো রিয়াল লাইফ--হিউম্যান স্টোরি হয়।

হঠাৎ সৌরভের মনে পড়লো, দাদু তো দুপুরের দিকে খাওয়া-দাওয়ার পর একা একা কিসব লিখতে বসতেন। একদিন স্কুল থেকে টিফিনে বাড়ি ফিরে সৌরভ দেখেছিল—মোহিত বাগচি কী লিখতে লিখতে কলম হাতে তন্ময় হয়ে ওই জানলা দিয়ে বাইরের রাস্তায় তাকিয়ে আছেন। দৃষ্টি ঠিক কোনো দিকে নেই। বাইরে তাকিয়ে থেকে যেন চোখের পেছন দিয়ে নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে রয়েছেন মোহিত বাগচি।

দাদু। ও দাদু। কী অত লিখছো মন দিয়ে?

ও কিছু না—বলে দাদু তার সামনের খোলা খাতা বাঁ-হাতের তালপাখা দিয়ে ঢেকে ফেলেছিলেন। কারেণ্ট ছিল না।

কোনদিনই জানা হয়নি সৌরভের—মোহিত বাগচি কী লিখছেন? কি লেখেন মাঝে মাঝে? কি লিখতেন?

তখন তো মোহিত বাগচি ওকালতি ছেড়ে দিয়েছেন। তার তো তখন আর কেস সাজিয়ে লিখে রাখার দরকার পড়তো না কোন। এক এক সময়ে—নানান বয়সে সৌরভের হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়েছে—দেখি তো খুঁজে একবার—দাদু অত কি লিখতেন। কিন্তু কোনদিনই খোঁজা হয়নি। যেমন হঠাৎ মনে পড়েছে—তেমনিই হঠাৎ সব ভুলে গেছে সৌরভ। সময়ের নানা স্তরে কয়লা যেমন চাপা পড়ে—আমাদের মনের ভেতরেও অনেক স্তরে অনেক জিনিস আমরা কয়লা করে রাখি। কোন-দিনই আর তোলা হয় না।

এবারের ছবিটা ভয়ঙ্কর চেনা লাগে ব্রজ বাগচির। এ যে ভীষণ চেনা। এই বাগচিধামেরই পেছন দিকটা দেখাচ্ছে। টিভি সব জায়গায় যায়!

মোহিত বাগচির প্রায় পঞ্চাশ হবে। পেটানো মজবুত শরীর। একজন সফল উকিল যেমন ঠাটেবাটে থাকেন—তেমনই পোশাক-আশাক। গা য় একটি সিল্কের ।পাঞ্জাবি—পায়ে চিকচিক করছে পাম্পসু। বাঁ হাতের কবজিতে তখনকার ওমেগা ঘড়ি। ধুতির কোচার ডগা বাতাসে ফরফর করে উড়ছে।

মোহিত বাগচি ডাকছেন, ও বিরাজি। বিরাজি।

কোন সাড়া নেই। মোহিত ফিরে যাবেন কিনা—এমন দোনামনা-ভাবে দুলছেন। এমন সময় বিরাজি তার কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এল। মাথার খোপাটি ভাঙা। কপালে ঘাম। চোখের নিচে ডলা কাজল ছড়িয়ে পড়েছে।

বিরাজি বাঁ হাত দিয়ে মাথার চুল চেলে বলল—কি হল? ডাকাডাকি কিসের?

থমকে গেলেন মোহিত বাগচি। বললেন, বলছিলাম কি?

ঝেড়ে কাশুন না। আমি মরছি জ্বরের জ্বালায়—

জ্বর হয়েছে? জানতাম না তো। আমরা একই কম্পাউণ্ডে থাকি—অথচ—

যার জানার তিনি জানেন। বৌদিদি বার্লি করে দিয়েছেন কাল সন্ধ্যেবেলা।

মোহিত বাগচি বুঝলেন, তাঁর স্ত্রীর সব দিকে নজর আছে। উদ্বেগ মুছে গিয়ে মুখের ভাব মসৃণ হয়ে গেল। ব্রজ বাগচি টিভি-র দিকে তাকিয়ে বললেন, মায়ের সবদিকে নজর ছিল।

বিরাজি ফের বললো, ডাকাডাকি কিসের?

এখন থাক বিরাজি। পরেও বলা যাবে।

না না। এখনই বলুন না। ডাকলেন যখন—কথাটা হয়ে যাওয়াই ভাল।

বলছিলাম কি—

থামলেন কেন উকিলবাবু। ঝেড়ে কাশুন।

জাঁমটা দে না। লিখে দে—

এ-জমি তো আপনারই। আমি আর কতদিন। ভেতরদিকে এ-জায়গা কেউ কিনতে আসবে না।

বালাই ষাট। তুই একশো পার করে তবে মরবি। সবাই তো সবসময় থাকে না রিরাজি। ভবিষ্যতের কথা ভেবেই বলছি। এটুকু খিচ থাকে কেন? ব্রজ বড় হলে তার জায়গায় কোন কাঁটা থাকবে না। বসতবাড়িতে কেউ কি কোন খিচ রাখে।

তাহলে বলি উকিলবাবু। এটা তো আমারও বসত জায়গা ছিল। আম-কাঁঠালের বাগান নিয়ে আমি থাকতাম। আপনি এমন করেই বললেন—তা আমি লিখে দিলাম—এই তিন শতক বাদে সবটা। আপনি বাগান কেটে বাড়ি করলেন। পসার হোল। মেয়েদের বে দিলেন। বলেছিলেন—একই বসত জায়গায় আমরা মিলেমিশে থাকবো বিরাজি। তা আপনি আমায় প্রায়ই কারবার বদলাতে বলেন—

বলি এজন্যে বিরাজি—আরও তো হাজারটা কারবার আছে—

আছে জানি উকিলবাবু। এও জানি তেজরাতি আর বেশিদিন চলবে না। ব্যাংক এসে গেছে বাজারে। কিন্তু আমিও যে তেজরাতি-বন্ধকী ছাড়া কিছুই আর জানিনে—

ব্রজ বাগচি টিভি দেখছিলেন—আর ভাবছিলেন—এই জেলা শহরটা গড়ে ওঠার মুখে মুখে অনেকেরই অনেক জায়গা ছিল। পাড়াগাঁ আমলের জায়গা। পাড়া গাঁ থেকে গঞ্জ। গঞ্জ থেকে শহর।

কিছুই তোকে বদলাতে হবে না বিরাজি। জায়গাটা দে না—লিখে দে—

দেওয়াই আছে উকিলবাবু। লিখে আর বি হবে! মুখের কথার চেয়ে লেখাযোখা কি বড়?

ব্যর্থ মুখে মোহিত বাগচি দাঁড়িয়ে। বিরাজি নিচু হয়ে তার কুঁড়েতে ঢুকে যাচ্ছে। দরমার দেওয়াল। নিজের জায়গায় ফিরে যাওয়ার মুখে বিরাজির পায়ের মল তিনবার বেজে উঠলো। ঝম্ ঝম্

ঝম্। মোহিত বাগচি দেখলেন, কুঁড়েতে ঢোকার মুখে বাঁ হাতে বিরাজির বসানো নয়নতারা ফুল এলেবেলে হয়ে দুলছে।

সৌরভ একখানা জাব্দা খাতা পেল। তাতে রুল টেনে লেখা। চোখ বুলিয়ে দেখলো। বাজারের হিসেব।

২৫ জুলাই : ১৯৩০

ল্যাণ্ডলেডি অ্যাজ লোন — ২-০-০

সৌরভ বুঝলো, তখন টাকা, আনা, পাই পর্যন্ত চলতো। তার মানে বিরাজিরও মাঝে মাঝে ধার করতে হোত। দু'টাকা নিশ্চয় অনেক টাকা ছিল তখন।

ভুবন মিত্র ফর মেডিসিন — ০-৪-০

ভুবন মিত্র দাদুর পুরনো মুহুরি। খুব ছোটবেলায় তাকে দেখেছি। বিরাজির ঘরের কাছে—শ্রীধরের বাসনপত্রের ঘরের পাশের ঘরখানিতে থাকতেন। দাদু ওকালতি ছেড়ে দিলেও তিনি মুহুরিগিরি ছাড়েননি। শনিবার করে দেশের বাড়িতে পরিবারের কাছে যেতেন। সোমবার খুব ভোর ভোর ফিরে আসতেন। দাদু মারা যেতে তিনিও মুহুরিগিরি ছেড়ে দিলেন। দিয়ে দেশের বাড়িতে গিয়ে পাকাপাকি বসলেন।

বাজার এক্সপেনসেস অ্যাণ্ড কাউডাং কেক — ০-৫-০

মাস্টার্ড + কেরোসিন + কোকোনাট অয়েল — ০-১০-৬

মিল্ক অ্যাণ্ড সুগার — ০-৪-০

রিফ্রেশমেণ্ট ফর সেলফ্ — ০-৩-০

লম্বা চওড়া মানুষ ছিলেন মোহিত বাগচি। কোর্টে খিদে পেত। তাই তিন আনার খাবার খেয়েছিলেন ১৯৩০ সালের ২৫শে জুলাই দুপুরবেলায়।

ম্যাঙ্গোজ — ০-৩-১

ব্রেড্ + বিসকিট + মুড়ি — ০-৪-০

পুজো ফর ওয়াইফ — ০-১-৬

ঠাকুরমার জন্যে হয়তো পোড়ামাতলায় পুজো দিয়েছিলেন দাদু সেদিন। ১২ই আগস্ট ১৯৩০-এর হিসাবে চোখ আটকে গেল সৌরভের।

কোল হাফ মণ্ড্	—	০-৬-০
বিরাজি বাই মর্টগেজ অফ ওয়ান চুড়ি	—	১০-০-০

তখনো তাহলে মোহিত বাগচির পসার জমেনি। চুড়ি বন্ধক দিতে হচ্ছে বিরাজির কাছে।

এগস্ ৪টি	—	০-২-৩
ভুবন মিত্র ফর লোন	—	৮-০-০
জিলাপি অ্যান্ড কাউডাং কেক	—	০-৩-৩
ফি ফর ডক্টর ক্ষীরোদ দে	—	২-০-০

পড়তে পড়তে এক জায়গায় কোন হিসেবই লেখা নেই। সেখানে মোহিত বাগচি বাংলায় লিখতে শুরু করেছেন। সৌরভ খাতাখানা চোখের কাছে নিয়ে এল। সেই যে একদিন দেখেছিলাম—দাদু তন্ময় হয়ে লিখতে লিখতে জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। এ লেখা কি সেই লেখা?

ব্রজ বাগচি নিজেই বুঝতে পারছেন না—তিনি ঘুমের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছেন? না, টিভি-তেই সব দেখতে পাচ্ছেন? জানলায় এসে সন্ধ্যেবেলা দাঁড়িয়ে।

বড় জামাইবাবু ভৌমিক মশায় তার ঐশ্বর্যময়ী ঔষধালয় থেকে চ্যবনপ্রাস নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বড়দি বললেন, তোমার মুখখানা অমন দেখাচ্ছে কেন?

জ্বর এসেছে।

ভৌমিক মশাইকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। খুব সুপুরুষ ছিলেন বড় জামাইবাবু। বাবা নিজের কাছে রেখে মানুষ করেছিলেন। একাশি টাকা দিয়ে বড় জামাইবাবুর জন্যে ভিষগরত্ন উপাধি কেনা হয়।

ঐশ্বর্যময়ী ঔষধালয়ের সাইনবোর্ডে বড় জামাইবাবুর নামের পাশে ভিষগরত্ন কথাটি লেখা হয়।

দেখি—বলে বড়দি এগিয়ে গেল। বড় জামাইবাবুর কালচে কপালে বড়দির হাতের চারটি ফর্সা আঙুল। উঃ! জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে। শুয়ে পড়।

বেশি রাতে বাগচিধামের সামনে ঘোড়ার গাড়ি থামলো। ধুতির ওপর কোট গায়ে ডাক্তার ক্ষীরোদ দে নামলেন।

মোহিত বাগচি এগিয়ে এলেন। ডাক্তার, আমার বড় জামাই এটি। ছেলের মতই আমার হাতে মানুষ। বাবাজির ভরা সংসার। মেয়ের মোটে বত্রিশ বছর –তুমি আমায় বাঁচাও –

আচ্ছা চলুন তো দেখি।

ভুল বকছে—

বড়দি দরজার চৌকাঠে বসে পড়েছে। জামাইবাবুর কাছেও যাচ্ছে না। ভৌমিকমশাই প্রলাপের ভেতর বারবার বলছেন, ঈশের মূলে ইঙ্গুদি দিলে—তারপরেই কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

ব্রজ বাগচি দেখলেন, বাগচিধামের সামনে খোলা জায়গাটায় কয়েক-জন মিলে একখানি পালঙ্কের নিচে বাঁশ ফিট করছে। বেলা ন'টা নাগাদ ভৌমিকমশাইকে হরিবোল দিয়ে সবাই নিয়ে চললো। ওই তো আমি। ব্রজ দেখলেন—তখনকার ব্রজ তার জামাইবাবুর খাটে কাঁধ দিয়েছে।

ব্রজ বাগচি চোখ বুজে ফেললেন।

সৌরভ পড়তে পড়তে মোহিত বাগচির গদিমোড়া চেয়ারটায় বসতে গেল। অমনি কয়েকটা পোকা লাফ দিয়ে তার গায়ে উঠেই টেবিলে লাফিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে সৌরভ ঝাড়ন দিয়ে সেগুলোকে মারলো। সব মরলো না। একটা উচ্চিংড়ে মরলো শুধু। বাকিরা পালিয়ে গেল।

....আমি জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ব্যর্থ হইয়াছি। অথচ আমার পিতাঠাকুর গৌরী বাগচি জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সফল। তিনি কোনদিকে না তাকাইয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। আমি সর্বদিকে কর্তব্যপরায়ণ ও সুসম্পূর্ণ হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। সেই চেষ্টার পরিণতি কি এই? এখন জীবনে কোন স্বাদ নাই। আমার নিজেরও কোন সাধ আর নেই।

বড় বাবাজীবন নাই। মেজো বাবাজীবনও গেল।

আমি বিষয় সম্পূর্ণ, নির্ব্যূঢ়, নিষ্কণ্টক করিতে গিয়া কি করিলাম! সেই পাপেই কি অদৃষ্ট এইভাবে শোধ তুলিল?........

পড়তে পড়তে চোখ তুললো সৌরভ। আগেকার কালি ক্ষয়ে এসেছে। পাতাগুলো হলুদ। একটানা পড়া যায় না। দাদুর হাতের লেখাও জড়ানো। বিষয়? কিসের বিষয়? কোন্ বিষয়? জায়গা-জমি? রহমতপুর? ঝাউদিয়া? বাগচিধাম? কোন কূলকিনারা পেল না সৌরভ।

ব্রজ বাগচি যেন নিজেই ডেকে উঠলেন, ও মেজ জামাইবাবু? কোথায় চললেন?

হন হন করে হেঁটে চলেছেন ভাদুড়ি মশাই। কোনদিকে না তাকিয়ে।

টি ভি-র পর্দায় তখনকার তাজা উকিল ব্রজ বাগচি রাস্তায় নেমে পড়ে ডাকলো, ও ভাদুড়ি মশাই! কোথায় চললেন?

ফিরে দাঁড়ালেন ভাদুড়িমশাই। সিঁথি করে আঁচড়ানো মাথার চুল। পাট পাট করে। গলাবন্ধ সাদা টুইলের শার্ট।—পেছন থেকে কেন ডাকছো?

এখনো তো কোর্ট খোলেনি।

আগে গিয়ে গাছতলায় বসে থাকবো। পেশকারদের কিছু আগেই যেতে হয়।

আমিও তো যাবো মেজ জামাইবাবু। আমিও তো উকিল।

তোমাদের পরে গেলেও চলে। — বলেই হন হন করে ভাদুড়িমশাই এগিয়ে গেলেন।

খানিকবাদে ব্রজ বাগচি কালো কোট হাতে বেরোবেন। এখনকার ব্রজ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন। বেশ সুন্দর ছিলাম তো তখন।

ব্রজ—

যাই বাবা। — বলে ব্রজ বাগচি সামনের ঘরে গিয়ে দেখলেন —তার বাবা মোহিত বাগচি খালি গায়ে বসে আছেন তাঁর চেয়ারে। একি? আপনি আজ বেরোবেন না?

না।

কি ব্যাপার বাবা?

ব্যাপারটা গুরুতর।

ব্রজ বাগচি মুখ তুলে চাইলেন।

তোমার মেজ জামাইবাবু বেশ কিছুদিন হোল আদালতে যাচ্ছে না।

এই যে দেখলাম—হন হন করে বেরিয়ে গেলেন। চান খাওয়-দাওয়া করে মাথা আঁচড়ে দিব্যি বাবুটি হয়ে বেরিয়ে যান রোজ সময়মত।

হ্যাঁ ব্রজ। সময়মত বেরোয়। সময়মত ফিরেও আসে। কিন্তু আদালতে যায় না।

কোথায় যান তাহলে মেজ জামাইবাবু?

কোর্টের বড় বকুলতলায় গিয়ে বসে থাকে। আসন করে।

সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি কথা ব্রজ। ভুবন তো বলেইছে। অন্য মুহুরিরাও বলেছে। শেষে আমিও নিজে দূর থেকে দেখেছি।

এভাবে তো পেশকারের চাকরি থাকবে না বাবা।

আমি জজ সাহেবকে বলে কয়ে চাকরিটা এখনো রেখেছি। কতদিন রাখতে পারবো জানিনা।

মা জানেন?

বলিনি।

মেজদি জানে?

না। বলিনি। এসবই কি আমার পাপে ব্রজ? বাবাজিদের প্রায় পথ থেকে তুলে এনে মানুষ করে—কাজে বসিয়ে তারপর তোমার দিদিদের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি।

কাউকে মানুষ করা পাপ নয় বাবা।

তবে তোমার মেজ জামাইবাবুর মাথায় পাগলামি দেখা দিল কেন?

তেমন কোন লক্ষণ দেখেছেন?

শুনেছি বকুলতলায় বসে একা একা হাসে।

সেবারে ম্যালেরিয়ায় মেজজামাইবাবু বড্ড বেশি বেশি মেফাথিনের বড়ি খেয়েছিলেন। সে জন্যেই হয়তো—

সৌরভ পাতা ওলটালো। ফের হিসেব—

৫ই জুন : ১৯৩৩

কুলু আপেল অ্যাণ্ড গোলাপখাস	— ০-৮-০
বৃন্দাবন সাহা ফর রাইস	— ৭-০-০

দাদুর তখনো তাহলে ধানচাষ শুরু হয়নি। কিংবা মাঠের ধান মাঠেই বেচে দিয়ে শহরের ফাইন রাইস কিনতেন। সবই আমার জন্মের আগে।

মথুরা সারভ্যাণ্টস্ পে	— ২-০-০
আকবর হোসেন মিস্ত্রি	— ৮-০-০
মদন কোলে ফর ব্রিকস্	— ১৪-০-০

দাদু তখন ঘরবাড়ি বাড়াচ্ছেন। এর পরেই লেখা—

…সবাইকে কাছে রাখিয়া গুষ্টি সুখে আনন্দে থাকিতে চাহিয়াছিলাম মাত্র। কিন্তু কপালে সহিল না। আমার শরীরে এখনো প্রাণশক্তি। আমি ফিরিয়া নগর বসাইতে পারি। কিন্তু বসাইয়া কী লাভ! সব সুখেরই একই পরিণতি। শুধু কি একজনের জন্য?

তাহাকে · আর পড়া গেল না। তবু সৌরভ চেষ্টা করলো।···তাহাকে সরাইয়াছি—ঠিক কী লেখা ছিল বোঝা যায় না। পোকায় কেটেছে। হয়তো—সরাইয়াছি—লিখেছিলেন দাদু। তাহাকে 'সরাইয়াছি বলিয়াই কি ?—এরপর বর্ষাকালের জল ঢুকে কিংবা ড্যাম্পে অনেকটা লেখা মুছে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

সৌরভ মেলাবার চেষ্টা করতে লাগলো। বিষয় ? বাবা ? গুষ্টি-সুখ ? তাহাকে সরাইয়াছি বলিয়াই কি ? কাকে কে সরালো। কম পাওয়ারের বালবে অন্ধকার যেন আরও ঘন হয়ে উঠেছে। কতদিন আগেকার ফিলামেণ্ট। এখনো যে আলো দিচ্ছে—সেটাই তো অবাক কাণ্ড। হঠাৎ কী একটা কথা মনে ওঠায় সৌরভ বাগচি ভেতরে ভেতরে থর থর করে কেঁপে উঠলো।

মেজ জামাইবাবু জামরুল গাছটার মাথা সমান সমান পশ্চিমের ঘরখানায় থাকতেন। সেই ঘরখানাই ফুটে উঠলো টি ভি তে। ঠিক টি ভি-তে নয়। ব্রজ বাগচির মাথায়। ব্রজ বাগচি নিজেও বুঝতে পারছেন না ঠিক কোথায় দেখেছেন এসব। একবার মনে হল তার—আমার কি হার্ট অ্যাটাক হোল ! না, আমি মরে গিয়ে এসব দেখছি ?

অল্পক্ষণ হোল মেজ জামাইবাবু গলায় দড়ি দিয়েছেন। ভাল করে দিতেও পারেননি। পায়ের নিচের টুলটা লাথি মেরে সরাতে পারেননি, প্রাণেরই মায়ায়। মেজদি দেখতে পেয়েই ছুটে এসেছে। ও ব্রজরে—

ব্রজ বাগচিই নামাচ্ছে। খুব সাবধানে। সেই টুলে দাঁড়িয়েই। মোহিত বাগচি ঘরের দোরে। মুখে কোন কথা নেই। তিনি মেজ জামাইয়ের বডি নামানো দেখছিলেন।

ব্রজ বাগচি প্রায় বুকে করে মেজ জামাইবাবুকে নামালেন। খাটে শুইয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন· বাবা। ভাদুড়ি মশাইয়ের গা এখনো গরম।

মোহিত বাগচির মুখে কোন উচ্ছ্বাস নেই। তাহলে ক্ষীরোদকে ডাকো—

বর্ষার বিকেলবেলা। জেলা শহরের বড় রাস্তা দিয়ে নবীন উকিল পাঁই পাঁই করে বাইক করছে। মালকোছা দিয়ে পরা ধুতির ওপর সাদা ফুলশার্ট। আহা! মেজদির মুখখানা কী হয়ে গেছে।

ক্ষীরোদ ডাক্তার বাড়িই ছিলেন। বললেন, যাও যাচ্ছি।

না। তা হবে না। আমার সঙ্গে এখুনি যেতে হবে কাকাবাবু।

তা কি করে যাবো! আমার সহিস আসেনি এখনো। আস্তাবল থেকে ঘোড়া এনে গাড়িতে জুতলে তবে তো—

সে অনেক দেরি। আপনি এই সাইকেলের সামনে বসুন।

পাগল! আমি পড়ে যাবো যে—

সব্বোনাশ হয়ে গেছে ডাক্তারবাবু। আপনি বসুন।

কার কি হল রে বাবা—

গিয়েই দেখবেন।

দাঁড়াও। বাক্সোটা নিই।

সারা শহর অবাক হয়ে দেখলো—ব্রজ উকিল ক্ষীরোদ ডাক্তারকে সামনে বসিয়ে সাইকেল চালাচ্ছেন।

ক্ষীরোদ ডাক্তার ঘরে ঢুকেই ছুটে গিয়ে নাড়ি দেখলেন। তারপর ছাদের বর্গায় ঝোলানো ধুতির ফাঁস দেখে বললেন, জাস্ট এক্সপায়ার্ড। ভয়েই মারা গেছে।

তখনকার ব্রজ বাগচি ক্ষীরোদ ডাক্তারের দু'খানা হাত ধরলো। —ধরে বললো, একটু ভাল করে দেখুন না ডাক্তার কাকা। একটু আগেও যে গা গরম ছিল দেখে গেছি। যদি ভুল করেও বেঁচে থাকেন—

হাসলেন ক্ষীরোদ ডাক্তার। এখনো গা একটু গরম আছে ব্রজ। কিন্তু খানিকক্ষণ হল মারা গেছে।

ব্রজ বাগচির ঠাণ্ডা লাগছিল। জানলাগুলো খোলা। লাবণ্যর

কি হল ? একদম কর্তব্যজ্ঞান নেই। বউমাকে নিয়ে মেতে আছে। আশ্চর্য। গায়ের শালখানা দিয়ে মাথা কান আগাগোড়া ঢাকতে গিয়ে পায়ের ওপর থেকে শাল উঠে আসছে। সেখানে দিব্যি মশারা বসছে। ভাদুড়িমশাই শেষদিকে বিশেষ কথা বলতেন না। বাবা চেয়েছিলেন, আলাদা বাড়ি ভাড়া করে মেজদির সংসার গুছিয়ে দেবেন। হয়তো শ্বশুরবাড়ি থাকার জন্যে মর্যাদায় লাগছে। সবাই ডাকে মোহিত বাগচির মেজ জামাই সেটাই হযতো গায়ে লাগছে। সব পুরুষই সিংহ হতে চায়। হাত পা মেলে আড় ভাঙতে না পারলে অস্বস্তিতে ভোগে। বাবা হয়তো গোড়ায় এটা বুঝতে পারেন নি।

হিসেবের খাতার ভেতর থেকে একখানা পুরনো পোস্টকার্ড পড়ে গেল। দাম এক পয়সা। গোট গোট অক্ষরে লেখা—

আপনার মাতৃদেবী শ্রীমতী হরিমতি দেব্যাঃ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন বিগত মাঘি-পূর্ণিমার দিনে। তাহার শ্রাদ্ধশান্তি যথোচিতভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। পত্রপাঠ শ্রাদ্ধের ব্যয় তের টাকা পাঁচ আনা অত্র ঠিকানায় মানিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিবেন।

নিচে কাশীর ঠিকানা। নাম পড়া যায় না। মুছে গেছে। সৌরভ খাতা বন্ধ করে তার ভেতর পোস্টকার্ডখানা গুঁজে দিল। আমার বালক বয়সে দাদুকে দেখেছি। তখন তাকে দেখে কিছুই বুঝিনি। আগের শতাব্দীর শেষদিককার যুবক। এই শতাব্দীতে এসে পৌঢ়। ক্রমে বুড়ো, কোন কথা নেই মুখে—অনেকগুলো মৃত্যু পেরিয়ে এসে নিজে চলে যাবার জন্যে সব সময় রেডি। কিন্তু সময় হয়নি। সময় হয়নি। এক সঙ্গে সবাই মিলে কাছাকাছি থাকার আহ্লাদ করতে গিয়েছিলেন। কিছুই মেলেনি তার। মানুষের নিঃশেষ সত্য দিয়ে গড়া হয়েছিল মানুষের শরীরের ধুলো—তবুও হৃদয় তার অধিক গভীরভাবে হতে চায় সৎ। ভাষা তার জ্ঞান চায়, জ্ঞান তার প্রেম—

বড় এজলাসে জেলা জজ বসে। একদম গোরা। কিন্তু বাংলার জেলায় জেলায় জজিয়তি করে বাঙালীর ইংরেজি বুঝতে পারেন। ব্রজ বাগচি দেখতে পাচ্ছিলেন, এই জজের ঘরের সামনে সবাই পা টিপে টিপে চলে। দরজায় হলুদ পালিশ কাঠের ওপর সাদা হরফে লেখা— ডবলু জি ম্যালকম।

জজ ম্যালকম গম্ভীর মুখে বসে। তার মাথার পেছনে সম্রাট আর সম্রাজ্ঞীর ছবি। ম্যালকমের সামনে খোলা জায়গাটুকুতে পুরোদস্তুর উকিলের পোশাকে গুরুগম্ভীরভাবে এপাশ ওপাশ করে হাঁটছেন মোহিত বাগচি। যেন বা সিংহ।

কি একটা প্রশ্ন করলেন জজ সাহেব। ঠিক শুনতে পেলেন না ব্রজ বাগচি। সঙ্গে সঙ্গে মোহিত বাগচি সিংহের মত চাপা গুরু গুরু গলায় বললেন, দ্য হিন্দু ডেইটি ইজ পারপিচুয়াল মাইনর।

ম্যালকম জানতে চাইলেন, হাউ?

মোহিত বাগচি বললেন, গড ইজ ইমাজিনেশন—মিঙ্গলড উইথ বিলিফ ইওর অনার—

ব্রজ বাগচি গায়ের চাদর ফেলে সোজা হয়ে বসে হাততালি দিয়ে উঠলেন। চমৎকার চমৎকার বলেছেন বাবা—

ঘরে ঢুকে লাবণ্য এই দৃশ্য দেখে চাপা গলায় গরগর করে উঠলেন। পাগলের বংশ! কি দেখে এত হাততালি?

বাবার সওয়াল দেখছিলাম—

বাবার—? বলে এগিয়ে এলেন লাবণ্য। তারপর টিভি-র নবে হাত দিয়ে বললেন, তুমি তো সেকেণ্ড চ্যানেলে দিয়ে রেখেছো। ফট্‌ফট্‌ করছে সাদা স্ক্রিন। সেকেণ্ড চ্যানেল শুরু হওয়ার সময় হয়নি তো এখনো।

ব্রজ বাগচি অবাক হয়ে লাবণ্যর মুখে তাকালেন। মনে মনে বললেন, তাহলে এসব আমি কি করে দেখলাম? আমি তে মোদক বা গাঁজা খাই না কোনদিন।

স্বামীর মুখে তাকিয়ে লাবণ্য বললেন, দয়া করে এসব কথা সৌরভের সামনে পেড়ো না। ক'টা দিনের জন্যে এসেছে। এসে যদি জানে বাবা পাগল হয়ে গেছে—তাহলে এখুনি চলে যাবে। আর কোনদিন আসবে না।

তাহলে এতক্ষণ আমি কি দেখলাম ?

ওটা বুড়ো বয়সের ঝিমুনি। ঝিমুনির ভেতর অনেককিছু মনে আসে। যাই শ্রীধরের ঘরে ধুনোর ব্যবস্থা করি। পুরুত্মশাই এসেছেন।

আমিও যাচ্ছি। দাঁড়াও। ভীষণ মশা হয়েছে। শ্রীধরের মশারি ভাল করে গোঁজা দরকার। নয়তো কামড়ে ফর্দাফাই করে দেবে।

নয়

পাথরের শ্রীধর তার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেও তার ভেতরকার আসল শ্রীধর তখন অনেক দূরে। আজ ব্রজ বাগচির শহরে সকাল থেকে সন্ধ্যে অব্দি বারো ঘণ্টার বন্ধ। বাস বন্ধ। দোকানপাট বন্ধ। যারা ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করে কলকাতায় চাকরি করতে যায়—তারাও আজ বাড়িতে বসে গেছে। ঘরে ঘরে গরম মশাল্লা দিয়ে ডিমের ঝোল হচ্ছে। সবাই জানে এই ডিমের ঝোলের আলুগুলো সেদ্ধ হবে না। কোল্ড স্টোরেজের। তবু এই ডিমের ঝোলের গন্ধে গন্ধে বাড়ি বাড়ি সবাই তাস পিটতে শুরু করে দিল। কেউ দেখল না—শীতের সুন্দর সকালটা কেমন করে আস্তে আস্তে আস্ত একটা দিন হয়ে উঠছে।

এই আবহাওয়ায় অতিষ্ঠ হয়ে নন্দকিশোরই প্রথম রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। শহরের রাস্তাগুলো আজ বড় ফাঁকা। সে ঘুরে ঘুরে গোপাল আর শ্রীধরকে ডাকলো। চল চল। ঘুরে আসি কোথায়। এ আবহাওয়ায় কেউ টিকতে পারে—

রাস্তায় নেমে শ্রীধর বলল, সত্যি ! সারা শহরটা যেন পচে গেছে।

বালগোপাল বলল, কী এক বন্‌ধ ডেকে সারা শহরটাকে দমবন্ধ করে রেখেছে। চল নন্দদা কোথাও যাই—

চল, নিমাইয়ের বিয়ে দেখে আসি।

সে তো অনেক আগে।

তা হোক। বেশ জমজমাটি ব্যাপার। দেখতেও ভাল লাগবে।

গোপাল বলল, কোন্‌ নিমাই ?

নন্দ ওদের ভেতর কিছু বড়। একশো বছরের মত। সে প্রায় খেঁকিয়ে উঠলো। নিমাই আবার ক'জন ? জগন্নাথ মিশ্রের ছোট ছেলে—

গোপাল লজ্জা পেয়ে বলল, ওই যে অবতার হয়েছিল পরে !

হয়েছিল কি রে ! তুই নিজে একজন ভগবান হয়ে এসব কি কথা তোর মুখে ! হয়েছিল কি ? এখনো তো অবতার। সবাই বলে শ্রীচৈতন্য।

গোপাল কোন কথা না বলে মাথা নিচু করে থাকলো।

শ্রীধর বলল, তাহলে নন্দদা আমাদের তো নবদ্বীপ যেতে হয়।

নবদ্বীপ এখান থেকে খুব দূরে নয়। এ শহরটাই রেলের জংশন স্টেশন। এখান থেকে বাস আছে। ছোট রেলগাড়ি আছে। কিন্তু আজ যে সব বন্ধ। নয়তো নন্দকিশোর, বালগোপাল, শ্রীধর—তিনজনেরই ইচ্ছে ছিল—মানুষজনের সঙ্গে মিশে গিয়ে সারাটা পথ যাবেন। ওঁরা যখন নবদ্বীপ গিয়ে পৌঁছলেন—তখন নিমাইয়ের বিয়ে হচ্ছে।

নন্দকিশোর বলল, এটা নিমাইয়ের পয়লা বিয়ে নয়। পরে যে বউকে সাপে কামড়ালো।

শ্রীধর বলল, যা কিছু ঘটে সবই থেকে যায়। আশ্চর্য !

সবই থাকে শ্রীধর। নিজে কোথায় আছি জানতে হলে একবার করে ওসব দেখতে হয়।

বালগোপাল অনেকক্ষণ পরে মুখ খুললো। বলল, মানুষের একটা বড় সুবিধা আছে।

কিরকম?

চেষ্টা করলেই ওরা অবতার হয়ে যায়।

কি মুশকিল! আমরাই তো বলে বসে আছি—সম্ভবামি যুগে যুগে। ওরা কত কষ্ট করে অবতার হয় বলতো। তপস্যা। টানা উপোস। দেশের পর দেশ হেঁটে পার হওয়া। বউ থাকতেও আইবুড়োর মত থাকা। সমাধি। শিষ্য—ভক্ত জোগাড়। কত কি। সেই তুলনায় আমরা কি করি? কথাটি না বলে পাথরের ভগবান হয়ে যাই।

শ্রীধর খুব দ্বিধা জড়ানো গলায় বলল, ওরা কিন্তু আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জাঁকওয়ালা পুজো পায়। হইচই হয়। প্যাণ্ডেল সাজিয়ে সভা করে।

সে যদি বলিস শ্রীধর তো বলনা—ওদের নিয়ে সিনেমা ওঠে—নাটক হয়। যাত্রা চলে—

বালগোপাল হাঁটতে হাঁটতে বলল, আমরা হাজার হোক ভগবান। এক সময় আমাদের নিয়েও তো কম মাতামাতি হয়নি। যাত্রা সিনেমা সবই হয়েছে।

শ্রীধর বলল, গোপালভাই। ওদের যে এখন ভগবানও বলা হচ্ছে। রাস্তা জুড়ে প্যাণ্ডেল বেঁধে। লাল শালুতে বড় করে লিখছে—শ্রীশ্রীঅমুকচন্দ্র ভগবান।

নন্দকিশোর ওদের ভেতর বড়। সে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বলল, প্রথম প্রথম অমন বাড়াবাড়ি একটু হয়ই। হাজার বছর যাক। তখন সব কমে আসবে। এই দ্যাখ না—আমাদের নিয়ে কি আগেকার সেই মাতামাতি আর আছে।

তাই বলে নন্দদা—অবতাররা সব শ্রীশ্রীভগবান হয়ে যাবে?

হোক না কিছুদিন। আপত্তি কিসের?

বালগোপাল বলল, ওরা তো আসলে প্রেরিত পুরুষ। পয়গম্বর। অবতার।

নন্দকিশোর তিনজনের ভেতর বেশিদিন মানুষের সঙ্গে আছে। মানুষ সম্বন্ধে সে বেশি অভিজ্ঞও বটে। সে শান্ত গলায় বলল, অবতার না হয়েও মানুষ প্রায় অবতারের কাছাকাছি ভক্তি পায়। বাতাসা পায়। প্যাণ্ডেল পায়।

কিরকম ?

কেন ? বিদ্যাসাগর। রবীন্দ্রনাথ। নজরুল। নেতাজী। গান্ধী। আরও এক রকমের মানুষ আছে। তারা অত বড় না হয়েও তাদের নিজের নিজের এলাকায় ভালো লোক হিসেবে—মৃত্যুর পরেও তার চেনাশুনোর গণ্ডীতে দিব্যি অবতার হয়ে যায়। এদের কোন দোষের কথা শুনলে ভক্তরা বিরক্ত হয়। বিশ্বাস করে না তা।

নন্দদা তুমি সীমান্ত গান্ধী—হুগলীর গান্ধী—আরামবাগের গান্ধী এসব বলছো তো।

শুধু তাই কেন শ্রীধর ? ছোটখাটো ফ্যামিলিতেও পকেট গীতার মত পকেট অবতার গজায়। কারও দাদু—কারও জ্যাঠা ভালোমানুষী, পরিশ্রম, দানধ্যানের জন্যে মৃত্যুর পরে নিজের ফ্যামিলিতে রীতিমত ভগবান হয়ে যায়। ফটোতে নিয়মিত চন্দন, মালা পড়ে।

ওদের কথাবার্তা বাজনায় ডুবে গেল। মৃদঙ্গ, সানাই, জয়ঢাক, করতাল একসঙ্গে বাজছে। ভাটেরা রায়বার পড়ছে। এয়োরা জয়ধ্বনি দিল। ব্রাহ্মণরা বেদ পড়ছেন। বর নিমাই তাদের মাঝখানে বসলেন। সবাইকে গন্ধ, চন্দন, তাম্বুল, গুবাক, মালা দেওয়া হচ্ছে। খই, কলা, তেল, পান, সিঁদুর দিয়ে এয়োদের বরণ করলেন শচীদেবী। বর বেশে সেজে নিমাই চোখে কাজল দিলেন। এক হাতে ধান, দূর্বা, সুতো বেঁধে রম্ভামঞ্জরী আর দর্পণ ধারণ করে ছাদনাতলায় যাবার জন্যে দোলায় চড়ে বসলেন। এবার জয়ঢাক, বীরঢাক, কাহাল, পটহ, দগড়, শিঙ্গা, পঞ্চশব্দী বেজে উঠলো। নিমাই গোধূলি লগ্নে সনাতন মিশ্রের বাড়ি

ঢুকলেন। খানিক পরে সনাতন মিশ্রের মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইয়ের পায়ে মালা দিলেন। দু'জনে ফুল ফেলাফেলি করলেন। তারপরে দুজনে বাসরে ঢুকলেন।

বালগোপাল শ্রীধরকে বলল, ছেলেটি পরে অবতার হয়েছিল।

নন্দকিশোর প্রায় ধমকে উঠলো। সেজন্যে কম কষ্ট করতে হয়নি ছোকরাকে। জীবনের অর্ধেক পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়িয়েছে। চার চারটি নদী পেরিয়ে তবে নীলাচলে গেছে। যাগ্গিয়ে ওসব কথা। চল দেখি আমাদের নাম নিয়ে একদল লোক ভগবান সেজে বসে আছে। তাদের দেখে আসি চল।

নবদ্বীপের আরেকদিকে নন্দকিশোর, বালগোপাল, শ্রীধর চললো। এদিকটায় গঙ্গার ঘাট প্রায় জঙ্গলে ঢাকা।

সেই জঙ্গলের গায়ে এক সন্ন্যাসী দিব্যি সংসার পেতে বসেছে। নন্দকিশোর তার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, ওই যে ভৈরবী সেজে ঝুঁটি বাঁধা সন্ন্যাসিনী হোমের কাঠ সাজাচ্ছেন—ওটি ওই সাধুর নিজের বউ।

বউ?

হ্যাঁ। আরেকটু রাত হোক—দেখবে ওই লোকটা 'আনন্দ'! —'আনন্দ'!! বলে চেঁচাচ্ছে—আর অমনি ওর ভৈরবী মদ এগিয়ে দিচ্ছে। আর খেয়েই সন্ন্যাসীটি চেঁচিয়ে বলবে—'আমি রঘুনাথ।'

কোন রঘুনাথ নন্দদা?

হাসালি শ্রীধর! রঘুনাথ আবার ক'জন? তিনি তো একজনই।

ও বাবা! একদম রঘুনাথ সেজে বসে আছে সন্ন্যাসীটা?

তবে কি! কাল সকালে দেখবে কত ভক্ত তাদের এই রঘুনাথকে পুজো দিতে আসছে। এই জাল মহাপুরুষরা নিজেদের ভগবান বলে প্রচার করে আসছে। চিরকালই এমন জাল মহাপুরুষ দেখা দিয়ে থাকে। একজনকে দেখবি গোপাল—সে নিজেকে গোপাল বলে চালাচ্ছে!

গোপালই বলল, না। ওসব দেখতে ইচ্ছে করছে না। চল ফিরে যাই।

অন্য কোন যুগে যাবি? আরও পিছনে চলে যেতে পারি।

না। দরকার নেই। চল যে যার বাড়ি ফিরে যাই।

কেন? মেজোকর্তার জন্যে মন কেমন কেমন করছে? এই হোল গিয়ে মায়া গোপাল! মায়া বাড়াবে যত ততই বাড়বে কিন্তু।

দশ

বন্‌ধের দিন সন্ধ্যেবেলা শহরটা আবার প্রাণ ফিরে পাচ্ছিল। ব্রজ বাগচির কেমন একটা আতঙ্ক এসে গেছে। তিনি টিভি খুললেই যে নতুন স্টেশনগুলো পাচ্ছিলেন—যেমন মোহিতনগর, ঝাউদিয়া, রহমতপুর—সেগুলো নাকি টিভি-র পর্দায় আদৌ ভেসে উঠছিল না। কেননা, লাবণ্য নিজে এসে দেখেছে—দু'নম্বর চ্যানেলে টিভি-র নব ঘোরানো ছিল। তখন দু'নম্বরে কোন প্রোগ্রামই ছিল না। পর্দা—স্রেফ সাদা। আর সেই সাদায় নাকি শুধু তিনি একাই ওসব দেখতে পাচ্ছিলেন।

টিভি-র উল্টোদিকে বসে তিনি নিজেই নিজেকে বোঝালেন, দ্যাখো শ্রীধর। আমি বুড়ো হয়েছি সত্যি—কিন্তু আমার তো ভীমরতি হয়নি। আমি নিয়মিত মর্নিং ওয়াক করে থাকি। সারাদিনে খুব বেশি কিছু খাই না। আমার শরীর হালকা। রোজ সকালে দিব্যি কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। আমরা দৌলতপুরের ঝাউদিয়ার বাগচি। আশি বছরের ওপর এই শহরে আছি আমরা। আমার অন্নপ্রাশন পৈতে বিয়ে খুবই ধুমধাম করে হয়েছে। আর একটি কাজ বাকি আছে। যাতে আমার আর লাবণ্যর শ্রাদ্ধ খুব ভালভাবেই হয়—সেজন্যে দু'জনের নামে জয়েণ্ট অ্যাকাউণ্টে ভাল মত টাকা রাখা আছে। সৌরভের কোনই অসুবিধা হবে না।

ব্রজ বাগচি অবাক হয়ে দেখলেন, তিনি নব না ঘোরালেও টিভি আপনাআপনি খুলে গেল। বড় বিচিত্র! সেতারের ভারি সুন্দর একটি গৎ-এর সঙ্গে সঙ্গে রহমতপুরের তামাক ক্ষেত পর্দায় ভেসে উঠলো। বাঁশবাগান। মোহিত বাগচির দীঘি। দেবোত্তর সাতাশ বিঘা তো কম জায়গা নয়। লাল সিমেণ্টের মেঝের ওপর ব্রজ বাগচি দেখতে পেলেন—তার মা বসে।

শীতের পড়তি বেলায় পরিষ্কার রোদ—কিন্তু তাত নেই। কেন না, মায়ের কোলের ওপর সাদা একখানি কম্বল। মা কি সত্যিই বেঁচে আছে? যা দেখতে পাচ্ছি মায়ের বয়স বড় জোর পঁয়ষট্টি ছেষট্টি। আমার এখন যা বয়েস—তা থেকে প্রায় বিশ বছর কম।

কী আহ্লাদী, অবুঝ মায়া মাখানো মুখ মায়ের। মাকে আমার এখন খুব স্নেহ করতে ইচ্ছে করছে। হোক না মা। পৃথিবীর বিপদ আপদ একদম বোঝে না। জানেই না আর ক'দিনের ভেতর মরে যাবে। মা এই বয়সেই মারা যায়।

অমনি ব্রজ বাগচি দেখলেন, তার খুড়তুতো মনোদিদি মায়ের মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। দিতে দিতে কথা বলছে। মায়ের মাথায় এক ঢাল চুল ছিল।

মনোদিদি ঃ জ্যাঠাইমা। একটা কথা বলি। মনটা শান্ত করুন।

চুল বেঁধে দেওয়ার জন্যে মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে মা বেশ ছোট মেয়েটির মত জানতে চাইল ঃ কেনরে মনো? কি হয়েছে? কি এমন দেখলি তুই যে আমারই মন শক্ত করতে হবে?

মনোদিদি ঃ মনটা শক্ত করুন জ্যাঠাইমা। জ্যাঠাবাবু আগে যাবেন। শরীরটা ভাল নয় ওঁর।

এ কথায় রহমতপুরের তামাক ক্ষেত, দীঘির পাড়, আখের ক্ষেত, টিনের চাল দেওয়া পাকা বাড়ি, কচুবন—তাতে উড়ে বেড়ানো ভীমরুল —সব যেন একসঙ্গে থর থর করে কেঁপে উঠলো। শীতের দুপুরের বাতাসের ঢংঢাং সেরকমই।

মা প্রায় তেড়েফুঁড়ে বলে উঠলেন। কি? আমায় ফাঁকি দিয়ে যাবে? ওটা হচ্ছে না।

টিভি'র পর্দা থেকে ছবি মুছে গিয়ে সবটা সাদা হয়ে গেল। ব্রজ বাগচি পরিষ্কার মনে করতে পারলেন, বাবা তাকে ডাকছেন। গাঢ় গম্ভীর গলা মোহিত বাগচির।

আমায় ডেকেছেন বাবা—

হ্যাঁ। শোন ব্রজ! তুমি আমার একমাত্র ছেলে। তোমাকেই সব দেখতে হবে। প্রস্তুত থাকো। আমার তো বয়স হয়েছে।

আমি তো সবই যতটা পারি করে রাখছি। বর্ষার আগে রহমতপুরের জায়গার সব জলপথ আটকে রেখেছি। তাহলে চাষের জল বাঁধা পড়বে। প্রথম দফাতেই বীজ ফেলতে কোন অসুবিধে হবে না। মোহিতনগরের জায়গাগুলোর মিউটেশন করাচ্ছি এক এক করে।

আহা! ওসব নয় ব্রজ। আমি বলছি অন্য কথা—

ব্রজ বাগচি ভাল করে তাকালেন মোহিত বাগচির মুখে।

মোহিত বললেন, নাট্যনিকেতনে তো অনেক থিয়েটার করলে। কিন্তু এবার থেকে তুমি একটু আমার কাজগুলো বুঝে নাও।

বলুন।

তোমার দিদিরা রয়েছে। তারা সবাই অল্পবয়সে বিধবা। তাদের সুবিধে অসুবিধে দেখবে। তোমার ভাগনে ভাগ্নীদের শরীর স্বাস্থ্য—পড়াশুনো সবই তুমি নজর রাখবে। তুমিও বাবা হয়েছো। তোমার ভাগ্নে ভাগ্নীদের বাবারা অকালে চলে গেছেন। তাদের বুঝতে দেবে না—তাদের বাবা নেই। নিজের ছেলের সঙ্গে সমান স্নেহে আদরে ওদের মানুষ করবে।

ব্রজ বাগচি মাথা নাড়লেন।

দ্যাখো ব্রজ। সম্বচ্ছরের ধান, ডাল রহমতপুর থেকে আসে। আসে সর্ষে। ঘানিতে ভাঙিয়ে তিনমাস অন্তর তুলে রাখবে। নারকেল গাছ, খেজুর গাছ, তালগাছ সব জমা দেওয়া আছে। নারকেল তেল,

গুড়, সময়মত ওরা দিয়ে যায়। আখ থেকে রস করিয়ে চিনি বানাবার ঘরোয়া স্বদেশী কল রয়েছে—তোমাদের ওই কি জায়গা—

ব্রজ বাগচি ঠিক বুঝতে পারলেন না কোন্ জায়গা। বাবার মুখে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

ওই যাকে এদানীং তোমরা সবাই বলছো মোহিতনগর। আমার কিন্তু ওনাম একদম পছন্দ নয় ব্রজ। প্রাতঃস্মরণীয় মানুষের তো অভাব নেই আমাদের দেশে।

আপনি আমি কি করতে পারি বাবা। লোকে আপনাকে ভালবাসে। তাই নাম রেখেছে—আপনার নামে। আর জায়গাটার পত্তনও তো আপনারই হাতে—

তা ওখানে দু' গো-গাড়ি আখ পাঠিয়ে দিলে তিরিশ সের চিনি চলে আসবে। ভাঙানী, জ্বালানীর খরচ খরচা আখ থেকেই উঠে যাবে। তোমায় ঘর থেকে কিছু দিতে হচ্ছে না। মোহিতনগরের দীঘি দুটো জমা নিয়েছে ওখানকার দীনু জেলে। সে দু'দিন অন্তর একটা করে বড় রুই কি কাতলা দেবে। তাতে হয়ে যাবে না?

মাছের সাইজ বুঝে বাবা—

সবই তো আমার হাতে বড় করা মাছ। তুমি অফিস করে তো আর মাছ দেখতে পারবে না ব্রজ। তাই দীনুকেই জমা দিলাম। শ্রাবণ মাসে ফি বছর দুই দীঘিতে এগারো কুনকে করে মাছের পোনা ছাড়বে। জোল কাটা আছে—নতুন জলে সাত আট মাসে চারাগুলো আড়াইপো তিনপো হয়ে যাবে। আরও ছ'মাস রেখে তবে তোলাবে। ততদিনে দেড়সেরি হয়ে যাবে সব মাছ। কেনাকাটা বলতে নুন, মশলা, সাবানসোডা, কেরোসিন, নীল, রিঠা, ফটকিরি, ত্রিফলা, সাবু, মিছরি—সবই পাবে সনাতন মুদির কাছে—

এত হিসেব দিচ্ছেন কেন বাবা?

আগে শোনোই না। মুদিখানা, আনাজপত্তর, ওষুধবিষুধ, বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন আর পুজো আচ্চায় দেওয়া-থোওয়া—এসব বাবদে

মাসপয়লায় তুমি দরকারি টাকা তুলবে ব্যাঙ্ক থেকে। জমায় হাত দিতে হবে না। জমে থাকা সুদের আলাদা অ্যাকাউন্ট তোমার নামে করা হয়ে যাচ্ছে।

আপনি থাকতে আমি এসব করবো কেন বাবা?

আমি তো এতকাল করলাম। এবার থেকে তুমিই সব দেখবে ব্রজ। আর হ্যাঁ। আসল কথাই বলা হয়নি। শোন ব্রজ—

আমি কিছু শুনবো না বাবা। আপনার কাজ আপনাকেই মানায়। আমি ওসব পারবো না।

এখন থেকে ব্রজ এসব তোমারই কাজ—তোমাকেই সব মানাবে। শোন।

আমি কিছুই শুনবো না বাবা।

তোমারও বয়স হচ্ছে। তুমি ছাড়া আমার কথা কে শুনবে। আমি মরলে আমার মৃতদেহ নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরো না।

ব্রজ বাগচি থম্ মেরে গেলেন। কোন কথাই এল না তাঁর মুখে। এসব কি কথা বাবার মুখে?

মোহিত বাগচি বললেন, আমার মড়ায় শুধু একগাছি খড় দিও। আমি সূর্যোদয়ের আগে যাবো। পূর্ব দিকে মুখ করে নামিও।

ব্রজ বাগচি মনে মনে বললেন, ওঃ! দিনক্ষণও স্থির হয়ে গেছে তাহলে! শ্রাদ্ধে কাকে বলা হবে তারও লিস্টি নিশ্চয় করে ফেলেছেন বাবা!! ব্রজ বাগচি ভাবলেন—একবার বলেন ব্রাহ্মণ বিদায়ের দক্ষিণা—পকেট গীতাগুলো কোথায় বাবা?

মড়ায় আবার একগাছি খড় কেন? না আমি উকিল নই। এখন যে জায়গা মোহিতনগর হয়ে উঠছে—ওখানে সর্বস্ব দিয়ে ধানচাষ করতে নেমেছিলাম। ধানে মার খেলাম। কিন্তু জায়গাটা পয়মন্ত হয়ে উঠলো। যত খানাডোবা নিয়েছিলাম সবই শেষে বাস্তু জায়গা হিসেবে বেশ অনেকটা চড়া দামে বিক্রি হয়ে গেল। সেই থেকেই আমার ফের ভুস করে ভেসে ওঠা। নয়তো সর্বস্বান্ত হয়ে ডুবে গিয়েছিলাম।

তাই আমি চাষী। আমার মড়া নামিয়ে তাতে শুধু একগাছি খড় দিও।

টিভি-র পর্দায় দৌলতপুর থানায় ঝাউদিয়া ভেসে উঠলো। ব্রজ বাগচি কাঠের মিস্ত্রি অতুলের বানানো চেয়ারখানায় ঝিমুচ্ছিলেন। টিভি-তে দীঘি দেখেই চিনলেন। এ তো ঝাউদিয়ার দীঘি। পাড়ে ফুলের বাগান। মা সাজিতে বেল ফুল তুলছেন। এমন সময় বড়দির দুই জামাই—ভারি সুন্দর দেখতে—অমিয় আর সনৎ ঘাটে এল। গায়ে ভাল করে তেল মেখেছে। ব্রজ দেখলেন মাকে দেখেই ব্রজর দুই ভাগ্নী-জামাই এগিয়ে গেল।

দিদিমার চান হয়ে গেছে? এরই ভেতর?

হ্যাঁ। নাতনী-জামাইদের মত আমার কি বেলা করে ওঠার জো আছে এবার গিয়ে পুজোর সাজ গুছিয়ে দিয়ে বসবো। পুজো হয়ে গেলে তবে এক কাপ চা খাবো।

তাহলে দিদিমা আপনার সঙ্গে আর সাঁতার কাটা হল না আমাদের।

কেন? কেন?

আমরা দুজনই তো আজ বিকেলে গিয়ে কলকাতার ট্রেন ধরবো।

তাই?

হ্যাঁ।

তাহলে চল। পুরুতঠাকুরের আসতে দেরি আছে। আজ আবার আমার বিয়ের দিন—

তাই নাকি দিদিমা! তাহলে চান করে উঠে সেলিব্রেট করতে হয়।

না গো নাতনী-জামাইরা। দিদিশাশুড়ির বিয়ের বার্ষিকী করে কাজ নেই। চলো তোমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাঁতার কেটে আসি।

ফের চান করলে শরীর খারাপ হবে না তো আপনার?

হলে হবে। নাতনী-জামাইদের সঙ্গে সাঁতার কাটার সুযোগ যদি আর না পাই। তাহলে তো আফসোসের সীমা থাকবে না।

ব্রজ বাগচি দেখলেন, তাঁর মা নাতনী-জামাইদের সঙ্গে দিব্যি মাঝ দীঘিতে সাঁতার দিচ্ছেন। মা তো একবার মুখ দিয়ে জলের কুলি ফোয়ারা করে ওপরে তুললো।

ঘাটের কাছাকাছি এসে মা যেন আর সিঁড়ির ধাপ খুঁজে পাচ্ছে না। দুই নাতনী-জামাই গোড়ায় বুঝতেই পারেনি। তারা ভেবেছে—তাদের রীতিমত আধুনিকা দিদিশাশুড়ি এতখানি সাঁতরাবার পর ঘাটের কাছাকাছি এসে নাতনী-জামাইদের সঙ্গে নতুন কোন রসিকতা করছেন।

যখন ওরা বুঝতে পারলো—তখন, ব্রজ দেখলেন—তাঁর মা তলিয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে দুই নাতনী-জামাই তাদের দিদিশাশুড়িকে তুলে ঘাটের ধাপে শুইয়ে দিল।

খবর পেয়ে বাবা ঘাটলায় এসে দাঁড়ালেন। ব্রজ দেখলেন, তিনি নিজে গিয়ে তাঁর মাকে পাজাকোলে করে তুলে আনছেন।

এরপর বাকিটা ব্রজ বাগচির সব জানা। টিভি-র পর্দায় ঝাউদিয়া দেখার আর কোন দরকার ছিল না তার। তিনি চোখ বুজলেন।

মা হাঁপাচ্ছিলেন। সেই অবস্থাতেই জানতে চাইলেন, পুরুতমশাই এসেছেন?

ব্রজ বললেন, ওসব নিয়ে তুমি এখন চিন্তা কোরো না মা।

পুরুতঠাকুর এসেছেন কি না বল না?

এসেছিলেন। লাবণ্য পুজোর সাজ গুছিয়ে দিয়েছে। তুমি একটু চুপ করে থাকো মা।

মা স্বস্তিতে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। আঃ! তাহলে আমি এখন এক কাপ চা খেতে পারি।

লাবণ্য চা করে নিয়ে এল। আদর করে চা খেলেন। খেয়ে কাপটা রেখে মা বললেন, তাহলে এখন আমি মরতে পারি।

ব্রজ চমকে উঠলেন। বলেন কি মা? এভাবে কেউ বলে-কয়ে মরে যায় নাকি।

মা বললেন, যা ব্রজ। তোর বাবাকে ডাক। আজ আমাদের বিয়ের দিন।

মোহিত বাগচি মায়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন। মা অনেক কষ্টে বাবার পায়ে মাথাটি ঠেকিয়েই সেই যে ব্রজর কোলে এসে সেঁধিয়ে পড়লেন—আর চোখ খুললেন না।

অনেকক্ষণ কেউ বুঝতেই পারেনি—মা কখন মরে গেছেন। ব্রজ বাগচির ঝিমুনি কাটলো একটি ডাকে। কচি গলার ডাক।

বড়বাবু। ও বড়বাবু। লোডশেডিংয়ের ভেতর শুয়ে আছো? এই নাও। আলো এনেছি।

ব্রজ অনেক কষ্টে চোখ চাইলেন। স্বপন দাঁড়িয়ে। হাতে তার ভাল করে মোছা চিমনির একটি হেরিকেন। সে-আলোয় ঘরের অন্ধকার কাটেনি। হাফপ্যাণ্ট পরা স্বপন। ডাঁটো। তাগড়া। কচি মুখখানা হেরিকেনের আলোয় অস্পষ্ট। ফটোর নেগেটিভের মত নাকের ডগা, চিবুক, চোখের মণি জেগে আছে। নিচুর দিক থেকে হেরিকেনের আলো স্বপনের পা থেকে ডাঁটালো উরু ধরে ছোট হাফপ্যাণ্টের ভেতর চলে গেছে।

ব্রজ বাগচি মনে মনে বললেন, এই তো আমার শ্রীধর।

ঠিক এই সময় সৌরভ ঘরে ঢুকলো। ধুতি, পাঞ্জাবি, পাম্পসু, মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। যাকে বলে যৌবনের তাজা ময়াম মাখানো লাবণ্য সারা মুখে। হেরিকেনটার সামনে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলো, আচ্ছা বাবা! আকবর হোসেন নামে কোন মিস্ত্রির নাম মনে পড়ে আপনার?

প্রশ্নটা এতই আচমকা—এতই বিচ্ছিন্ন—ব্রজ বাগচি ঘাবড়ে গেলেন। বললেন, আকবর হোসেন? মিস্ত্রি?

হ্যাঁ। হয়তো এ-বাড়ি তৈরির সময়কার কোন মিস্ত্রি—

এ বাড়ি তো নানান্ সময়ে তৈরি হয়েছে। কত মিস্ত্রি কাজ করেছে। ইয়াকুব, মুরতেজা, সনাতন। কত নাম সব মনে নেই।

কোন কোন অংশ আমার ছেলেবেলায়—কোনোটা বা আমার জন্মের আগে তৈরি।

মনে করে দেখুন তো—আপনার ছোটবেলায় আকবর হোসেন নামে কোন মিস্ত্রি—

অনেক পেছনে যাবার চেষ্টা করলেন ব্রজ বাগচি। হ্যাঁ। অমন একটা নাম মনে পড়ছে বটে আমার। বাবার কাছে টাকা চাইতে আসতো। আকবর কিংবা হোসেন নাম ছিল হয়তো।

না বাবা। আকবর হোসেন তার নাম ছিল।

এ-নাম তুমি পেলে কোথায়?

দাদুর পুরনো হিসেবের খাতায়। কাগজপত্র দেখতে দেখতে—

অমন-একটা নাম মনে পড়ছে বটে। সেই পোড়ামাতলা ছাড়িয়ে কবরখানা রোডে একখানা ভাঙাঘরে থাকতো। পানে লাল ঠোঁট। তা সে ঠোঁটের অর্ধেকটা শ্বেতীতে সাদা হয়ে আছে। কেন? তাকে দিয়ে কি হবে?

এতদিন তো সে আর বেঁচে নেই। থাকলে তার সঙ্গে গল্প করতাম।

কবেই মরে হেজে গেছে।

তখন মিস্ত্রির কত মজুরি ছিল?

তখন কত ছিল বলতে পারবো না। তবে নাইন্টিন থার্টিটুতে মিস্ত্রিরা পেত সারাদিন কাজ করে বারো আনা।

তাহলে একজন মিস্ত্রির নামের পাশে যদি আট টাকা লেখা থাকে তো কি বুঝবো বাবা?

কি আর বুঝবে! একসঙ্গে আট দশদিনের মজুরি নিয়েছে আট টাকা।

মদন কোলের নাম শুনেছেন আপনি?

মদন কোলে! কি করেন?

এখনকার লোক নন। ইটখোলা ছিল বোধহয়।

ওঃ! আগে বলবে তো। আমরা ডাকতাম মদন ইটালি বলে। তা তার ইটখোলা তো কবেই উঠে গেছে। তার ইটখোলার গর্তগুলো এখনো বড় বড় দীঘি হয়ে পড়ে আছে। তা তাকে কিসের দরকার?

সৌরভ বলল, নামটা পেলাম দাদুর খাতায়। আচ্ছা বাবা। তখন ইটের হাজার কত ছিল?

কখন!

এই ধরুন আপনাদের ছোটবেলায়।

তা বলতে পারবো না। তবে আমাদের প্রথম যৌবনে কত ছিল বলতে পারি।

কত?

আজ থেকে ষাট বাষট্টি বছর আগে কত আর! এক হাজার ইট মোষের গাড়ি করে সাত আট খেপে সাইটে পৌঁছে দিয়ে নিত সাত আট টাকা।

তাহলে মদন কোলের নামের পাশে যদি দেখি লেখা আছে আঠারো টাকা—তাহলে কি বুঝবো?

কি আর বুঝবে! একসঙ্গে দু'তিন হাজার ইট পৌঁছে দিয়েছিল হয়তো।

সৌরভ তখন-তখনই কিছু বলতে পারলো না। হেরিকেন হাতে স্বপন তখনো দাঁড়িয়ে। অতীত ভবিষ্যৎ কিছুই জানে না এমন এক কিশোর। যে কিনা তার বর্তমানকে লাফিয়ে দাপিয়ে—ঘুমিয়ে জেগে—ছেচে ব্যবহার করছে।

ব্রজ বাগচি আবারও মনে মনে বললেন, এই তো আমার শ্রীধর!

এগার

আজ বন্ধের দিন সারাটা দুপুর সৌরভ বাগচি কবরখানা রোডে ঘুরে ঘুরে আকবর হোসেন মিস্ত্রির বাড়ির সবকিছু যাচাই করেছে। তা হলে পর সন্ধ্যের মুখে মুখে পোড়ো কোলে ব্রিকফিল্ডে ঘোরাঘুরি করেছে।

কবরখানা রোডে সেই ভাঙা ঘরখানি আছে। কিন্তু আকবর হোসেন মিস্ত্রি নেই। দেখা হল তার মেয়ের ঘরের নাতির সঙ্গে। বছর পঞ্চাশেক বয়স। আমের সময় আম—জামের সময় জাম ফিরি করে বেড়ায়। সৌরভ আকবর হোসেনের কথা বলতেই সে বলে উঠলো, হা হা। সো হামারা নানীকা আব্বা হুজুর থা। আকবর হুসাইন মিস্ত্রি। তিনিই এ জায়গা কিনে রেখে যান। নয়তো আমার মত গরিব কি এখন শহরে জায়গায় থাকতে পারতো!

সৌরভ জায়গাটার দিকে তাকিয়ে দেখলো। দেওয়ালঘেরা কবরস্থান। দীঘি। সবেদা গাছ। কোন অবস্থাপন্ন ঘরের বাড়ির টানা রথের ভাঙাচোরা কঙ্কালটা পড়ে আছে একপাশে। তার গা দিয়ে শহরের একটি মাঝারি রাস্তা। এখানেও নিশ্চয় এখন ষাট সত্তর হাজার টাকা কাঠা। আকবর হোসেন হয়তো কিনেছিল বিশটাকা কাঠা। কেনার তো কোন লোক ছিল না তখন।

তখন ঠিক জায়গাটা কেমন ছিল তাই ভাবার চেষ্টা করলো সৌরভ। দীঘি—কবরস্থান—সবেদা গাছ—টানা রথ সবই ছিল ধরে নিচ্ছি। কিন্তু বাকিটা?

কোন এক বিপদের গভীর বিস্ময় আমাদের ডাকে—
পিছে পিছে ঢের লোক আসে।

আমরা সবের সাথে ভিড়ে চাপা পড়ে—
তবু—
বেঁচে নিতে গিয়ে জেনে বা না-জেনে
ঢের জনতাকে পিষে—ভিড় করে,
করুণার ছোট বড় উপকণ্ঠে—সাহসিক নগরে বন্দরে
সর্বদাই কোনো এক সমুদ্রের দিকে
সাগরের প্রয়াণে চলেছি।

ফলওয়ালা বলল, উহ্ যো বাগচিধাম হ্যায়....
সৌরভ বড় আগ্রহে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ—
উহ্ বাগচিধামকো বড়ে বাবু থা—মোহিত বাগচি—
হ্যাঁ হ্যাঁ—

উনকো সাথ্ বহোৎ দোস্তালি থা ইস আব্বর হুসাইনকা। রুপেয়া—বগেরা সব কুছ মিলতা থা উসসে—

সৌরভের মনে হচ্ছিল, আমি প্রায় গল্প পেয়ে গেছি। এখুনি অতীতের এমন একটা দরজা খুলে যাবে- যেখান থেকে আমাকে একটা দারুণ গল্প লেখার দড়ি ছুঁতে দেওয়া হবে। আমি সেই দড়ি ধরে এগিয়ে যাবো।

সন্ধ্যের মুখে শহরে প্রাণ ফিরে আসছিল। বন্ধের অন্ধ থাবা একটু একটু করে শহরটার ওপর শিথিল হয়ে এসেছে। প্রাইভেট বাস স্টার্ট দিচ্ছে। লম্বা রুটে এখন আর পাড়ি দেবে না। কাছে-পিঠের আটকে যাওয়া প্যাসেঞ্জারদের ছেড়ে দিয়ে আসবে। পান বিড়ির দোকানগুলো একবারে বিবিধভারতী ছেড়ে দিয়ে দোকান খুললো। যারা বিড়ি বাঁধে—তারা অনেকদিন পর বন্ধ বলে সারা দুপুর চোখ ভরে ঘুমিয়েছে। এখন অনেকে আগের বাঁধা বিড়ি একটা তোলা-উনুনের ওপর তারের জালে শুকোতে দিল।

মদন কোলের ইটখোলা নাকি যুদ্ধের পরেপর বন্ধ হয়ে যায়। শহরের শেষে খড়ে নদীর গায়ে সেই পোড়ো ইটখোলা। জরাজীর্ণ গেটের ওপর সাইনবোর্ড—কোলে ব্রিকফিল্ড।

ভেতরে কেউ নেই। বড় বড় গর্ত এখন প্রায় দীঘি। সন্ধ্যের অন্ধকারে তারা মুছে যাচ্ছিল। দু-দুটো লোহার পকমিল বাতিল হয়ে পড়ে আছে। ওদের গায়ে যুগের সেরা ষাঁড় জুতে দিয়ে মাখামাটির মাখাটা এই পকমিলে ফেলে সরেস করে নেওয়া হোত। এখন গজানো ঘাসের ভেতরে দু'দুটো চিমনি পড়ে আছে। তাদের গায়ে জায়গায় জায়গায় মরচে ধরে ফুটো। পাহারা-কুজির ভাঙা চালে বন ধুধুলের সবুজ লতা অন্ধকারে এখন মিশকালো।

একখানা ইট কুড়িয়ে নিল সৌরভ। এম কে। ইটের গায়ে দুই হরফে সংক্ষেপে মদন কোলে। বেশ বড় ইটখোলা ছিল বোঝাই যায়। কত কোটি ইট এখানে পুড়েছে। সেই সব ইট কত কত বাড়ির ভেতর এখন দেওয়াল-বারান্দা হয়ে আছে। চুন-সুরকি, চুন-ঘেষ, সুরকি-ঘেষের বাঁধুনিতে। পরে সিমেন্ট আসাতে বালি আর সিমেন্টের গাঁথুনীতে। এম কে। প্লাস্টারের নিচেও এম কে। পুকুর ঘাটলায় জলের নিচেও এম কে।

গল্পের আভাস থাকলেও আমি এখানে গল্প পাচ্ছি না কেন? জলে ভরে যাওয়া ইটখোলার গর্তে ব্যোম হয় অনেক সময়। পাম্প করেও জল ছেঁচা যায় না। পাতাল ফুটো হয়ে জল এসে ফের থই থই করে দেয়।

আমার এ জীবনের ভোরবেলা থেকে—সে সব ভূখণ্ড ছিল চিরদিন
কণ্ঠস্থ আমার;

একদিন অবশেষে টের পাওয়া গেল
আমাদের দু'জনার মত দাঁড়াবার তিল ধরণের স্থান
তাহাদের বুকে
আমাদের পরিচিত পৃথিবীতে নেই।

সময়ের নিরুৎসুক জিনিসের মতো—
আমার নিকট থেকে আজো বিংশ শতাব্দীতে তোমাকে ছাড়ায়ে
ডান পথ খুলে দিলো বলে মনে হলো
যখন প্রচুরভাবে চলে গেছি বাঁয়ে।
এরকম কেন হয়ে গেল তবে সব বুদ্ধের মৃত্যুর পরে কল্কি এসে
দাঁড়াবার আগে।

সন্ধ্যেবেলা ছুটতে ছুটতে লোডশেডিংয়ের ভেতর বাগচিধামের দোতলায় উঠে সৌরভ তাই ব্রজ বাগচির কাছে জানতে চাইল, আপনাব ছোটবেলায় আকবর হোসেন নামে কোন মিস্ত্রি—

সকাল থেকে বারো ঘণ্টা একটানা বন্ধের পর শহরটা সন্ধ্যে-সন্ধ্যে খুলে যাবার পরেও শহরের সভ্যতার গাদ লোকাল ভান, বড়াইয়ের সঙ্গে মিশে এক আশ্চর্য চানাচুর। তাতে বিটনুনের পচা গন্ধ। সারা শহরের লোকজন তাই ঘুমিয়ে পড়লো আগে আগে। কেননা, এই সব গন্ধের নেশা ধরানো ঘুম থাকে।

ভোররাতে ভীষণ এক শব্দে সারা বাড়ির ঘুম ভেঙে গেল। ব্রজ বাগচি যে ব্রজ বাগচি যিনি একবার ঘুমোলে চোখ সেলাই হয়ে যায় তিনিও বিছানায় উঠে বসলেন।

লাবণ্য বললেন, ওঠার দরকার নেই। বিরাজির ফুলবাগানের দিককার মোটা দেওয়ালটা বোধ হয় ধসে পড়লো।

আমরা যখন উঠেছি—সৌরভরাও নিশ্চয় উঠে বসেছে।

তাতো বসেছেই। যা শব্দ।

তাহলে লাবণ্য—তুমি একবার চেঁচিয়ে বলে দাও—

ভয়ঙ্কর শীত। তাতে শেষরাতের মায়াবী জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নায় বেরিয়ে এসে লাবণ্য দেখলেন, তিনি এতকাল বিশাল এক ভগ্নস্তূপের ভেতর ব্রজ বাগচিকে নিয়ে সংসার করে চলেছেন। মনটা ছ্যাং করে উঠলো। আমি তো এতদিন কিছুই টের পাইনি। শ্বশুরমশায়ের

সংসারের শেষটুকু ধরে বসে আছি বছরের পর বছর—এই ফাঁকা, ভাঙাচোরা স্তূপের ভেতর।

লাবণ্য চেঁচিয়ে বললেন, বউমা। ঘুমিয়ে থাকো। ওঠার দরকার নেই। একটা বড় দেওয়াল ভেঙে পড়েছে।

বিছানায় লাবণ্য ফিরে আসতেই ব্রজ বললেন, অতুল ওরা সকালে এলেই গা লাগাতে বলবো ওদের। ভাঙাচোরা দেওয়াল থেকে ইট খসিয়ে এনে থাক দিক আগে, তারপর ছাদ ধসে থাকলে কড়ি বর্গা দেখা যাবে।

এখন ঘুমোও। সকালেরটা সকালে দেখা যাবে।

ভোরবেলা বাগচিধাম ফের জেগে উঠলো। লাবণ্য নিজেই চাদর জড়িয়ে ইঁদারার তোলা জলে শ্রীধরের কোষাকুষি মাজতে বসলেন। তারপর পঞ্চব্যঞ্জন রাঁধবেন বলে কুটনো কুটতে বসলেন।

এর অনেক আগে ব্রজ বাগচি মাংকি ক্যাপ, গলাবন্ধ কোটে ভূষিত হয়ে রীতিমত মহাকাশচারীর চেহারা নিয়ে কুয়াশা-ঢাকা শহরের রাস্তায় মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে পড়েছেন।

সৌরভকে বেড-টি দেওয়া হয়ে গেছে রমার। এবার শ্বশুরমশাই মর্নিং ওয়াক সেরে ফিরলে সারা বাড়ির জন্যে চা করবে।

দিনের পয়লা রোদে শিশিরে-নাওয়া জামরুল গাছটা রীতিমত পোজ দিয়ে দাঁড়াল। কেননা, এবার তার গাদা গাদা পাতা থেকে সবুজ ঠিকরে উঠবে।

অতুল আসতেই স্বপন তাকে একগাল হেসে ওয়েলকাম জানালো, —কাল রাতে একখানা বড় দেওয়াল ধসেছে!

ধসেছে?—বলে অতুল এগিয়ে এল। ছায়া, রোদ, আলোয় তার বিশাল বয়স্ক শরীরখানা কিংকং-এর মত ভাঙা দেওয়ালের সামনে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই সে চেঁচিয়ে উঠলো, ভীষণ জোরে—এ কি? এ কি গো? ও বউদিদি—

স্বপন—কি ? কি ? বলে ছুটে গিয়ে সেই ধসা দেওয়ালের সামনে একদম বোবা। কোনও কথা নেই মুখে। তার দুই চোখ যেন বেরিয়ে আসার যোগাড়।

কি হ'ল ? অ্যাঁ—বলতে বলতে লাবণ্য এসে জামরুল তলায় দাঁড়ালেন। এত চ্যাঁচানি কিসের ? নাতি নাতনী দুটো ভোরবেলায় বিছানায় গড়ায়। তাদের অব্দি জাগিয়ে ছাড়লে ? কোন আক্কেল যদি থাকে—

দেখবেন আসুন।

লাবণ্য খুব সাবধানে স্বপনের কাঁধে হাত দিয়ে ভাঙা ইট, সুরকি, ঘেঁষের স্তুপের ওপর উঠলেন। উঠেই তিনিও একদম চমকে গেলেন। অতুল তখন লম্বা বাঁশ দিয়ে ভাঙা ইঁট সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিল।

কোন কথা না বলে লাবণ্য চুপ করে নেমে এলেন।

সবার শেষে এল সৌরভ। এত চেঁচামেচি কিসের ? বলতে বলতে সেও স্বপনের কাঁধে হাত দিয়ে ঢিবিটায় উঠলো। উঠেই সে চুপ করে গেল। অতুল লম্বা বাঁশ দিয়ে জিনিসটা ঘুরিয়ে দিতেই কনুইয়ের কাছে ধুলো মাখানো সুরকির দলা লেগে তোবড়ানো একখানি অনন্ত চিক্‌চিক করে উঠলো -জায়গায় জায়গায়। কঙ্কালটা প্রমাণ সাইজের। তবে হাঁটুর কাছে পা দুখানা মুড়ে দেওয়া।

চুন সুরকিতে গালের হাড়'সরে গেছে। বাঁশ দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে অতুল বলল, অল্প জায়গার ভেতর দেওয়াল গাঁথতে হয়েছিল। তাই লাসটা মুড়ে ছোট করে নিতে হয়েছিল।

সৌরভ চেঁচাবে কি ! একসঙ্গে অনেক কথা তার মনে আসছিল। এমন সুন্দর ভোরবেলায়—তার মনে হল—বাগচিধামে বিপদ নেমে এসেছে। সুনাম, প্রতিষ্ঠা সব যে এক হ্যাঁচকা টানে ধসে যায়।

সে চুপচাপ নেমে এসে পেছন বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে ডাকলো মা—

লাবণ্য ভোরবেলায় ওদিকটাতেই থাকেন। ওদিকেই শ্রীধর, ইঁদারা, ভোগের ঘর।

সৌরভ ঢুকে দেখলো, শ্রীধরের পঞ্চব্যঞ্জনের কুটনো কোটা শেষ হয়নি। খোলা বঁটি। তরিতরকারি ছড়ানো। মা তার উল্টোদিকের দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে। বাঁ-হাত কপালে। মাথার পাকা চুলের রাশি চারদিক ছড়িয়ে। দুই চোখ দিয়ে একই সঙ্গে জল পড়ছে লাবণ্যর।

সৌরভ কোন কথাই বলতে পারলো না। তখনো ব্রজ বাগচি মর্নিং ওয়াক থেকে ফেরেননি।